অক্ষয়কুমার দত্তঃ উনিশ শতকের একজন চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণার সারসংক্ষেপ

গবেষক

তন্ময় রায়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং A00HI0201316

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সমর্পিতা মিত্র

সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০ ০৩২

২০২৪

অক্ষয়কুমার দত্তঃ উনিশ শতকের একজন চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক

ভূমিকা

(ক) গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়

উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮৬ সালে মারা যান। তিনি ১৮৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত সুস্থ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি জীবনের মাত্র ৩৪-৩৫ বছর সবল-সুস্থভাবে কাটিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা-সমাজ সংস্কারে।

তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এবং একজন একনিষ্ঠ-বলিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারমূলক কার্যাবলীর পাশাপাশি ব্রাহ্মধর্মকে ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে *নব্য ভদ্রলোক*-দের কাছে গ্রহণযোগ্য করারও চেষ্টা করেছিলেন। এভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরে তখন, যখন তিনি একদিকে ব্রাহ্মধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে দেবেন্দ্রনাথের সাথে বিতর্ক করছেন, শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা এবং ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরীশ্বরবাদের চর্চা করছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে।

বর্তমান গবেষকের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হল উনিশ শতকের একজন সমাজ চিন্তক ও সংস্কারক হিসেবে অক্ষয় দত্ত সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন বা তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন এবং এর সামাজিক প্রভাব কতটা ছিল। সাথে বর্তমানে তাঁর কাজগুলির চর্চাও কতটা দরকারি।

উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমরা গবেষণা সন্দর্ভের পাতায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করব। তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। এরপর শিক্ষাদানের প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক, ভাষা শিক্ষার পুস্তক রচনা করেছিলেন। পাঠ্যপ্রণালী (Syllabus) কেমন হওয়া উচিত, কি কি বিষয়ের পাঠ্যদান প্রণালী (Curriculum) হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করেছিলেন। যা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আজও তার তাৎপর্য লক্ষণীয়।

তিনি উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ছিলেন। রামমোহন রায়, ডিরোজিও-এর পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারে তার ভূমিকা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন। তিনি কুসংস্কারে নিমজ্জিত উনিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনে সজোড়ে আঘাত দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু-সহকর্মী (সমদর্শী) ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা (বিদ্যাসাগর) যখন বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন তখন তিনি সমর্থক হিসেবে সর্বাগ্রে ছিলেন। এমনকি দত্ত বিদ্যাসাগরকে তাত্ত্বিক সমর্থনও প্রদান করেছিলেন। এছাড়া ঐসময় তাঁর হাত ধরে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারও ঘটে। এই সকল কাজই ছিল তাঁর জীবনের মূল নির্যাস।

(খ) গবেষণার তথ্যসূত্র এবং তথ্য ব্যবহারের প্রণালী

এই গবেষণা সন্দর্ভে অক্ষয় দত্তের জীবন কর্ম, চিন্তা ও মতাদর্শের পরিবর্তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রাথমিক আকর অবশ্যই তাঁর 'কাজ' এবং তাঁর রচিত বহুল এবং স্বল্প পরিচিত যাবতীয় প্রবন্ধ-সম্ভার ও গ্রন্থগুলি। পাশাপাশি, অক্ষয় দত্তের জীবনী এবং তাঁর লেখা ও কাজ নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত (প্রায়) যাবতীয় লিখিত তথ্যগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষয় প্রসঙ্গে আলোচনাতে তাঁর রচনাগুলিই আকর। সমসাময়িক কালে ব্যক্তি অক্ষয়ের গুরুত্ব কতটা ছিল সেই বিষয়টি তৎকালীন সময়ের চেয়ে আজ আরও বেশি করে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ সমসাময়িক কালে তাঁর গুরুত্ব খোঁজা অসম্ভব। দুশো বছর পরে আজ এই গুরুত্ব বুঝতে আমরা সক্ষম। তাই 'অক্ষয় চর্চা' দ্রুত গতিতে বাড়ছে।

অক্ষয় দত্তের উপর প্রকাশিত রচনাগুলি তিন ধরণের। এক, "জীবনীমূলক"। তাঁর সম্মতি নিয়ে মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন তাঁর জীবনী *'শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত'*। গ্রন্থটি ১২৯২ সালে (১৮৮৫ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয় দত্তের একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী হিসেবে এই বইটি এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত, কিন্তু বইটি অ্যাকাডেমিক অর্থে গবেষণাধর্মী নয়। গ্রন্থটিতে দত্তের জীবনকাহিনী যথাসম্ভব সবিস্তারে আলোচিত থাকলেও, মহেন্দ্রনাথ সমকালে প্রকাশিত অক্ষয় দত্তের বিপুল রচনাবলী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি সম্পর্কে যেমন কিছু লেখেননি, তেমন তাঁর রচনাবলী থেকে আহরণ করে তাঁর জীবন ও কর্ম (দার্শনিক চিন্তা) সম্পর্কেও এই বইটিতে সবিস্তারে কিছু লেখা হয়নি।

আরেকটি জীবনী লিখেছেন নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। তাঁর লেখা বইটি হল *'অক্ষয় চরিত'*, যাতে ছোট আকারে অক্ষয় দত্তের জীবনপঞ্জী রয়েছে। বইটি আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ১২৯৪ সালে (১৮৮৮ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে, বইটির কিছু অংশ সত্য-মিথ্যায়

মিশ্রিত। ফলে বইটির প্রামাণ্যতাসহ গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে। মূলত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেই নকুড়চন্দ্র এই বইটি লিখেছিলেন।

দুই, তাঁর উপর দুটি অ্যাকাডেমিক গবেষণার নানান ধারা। নবেন্দু সেনের *'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'* নামে প্রকাশিত বইটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য গবেষণাপত্র ছিল। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিঃ। এই বইটিতে গদ্য ভাষার স্রষ্টা হিসেবে অক্ষয় দত্তের বিভিন্ন গ্রন্থানুসারে তাঁর অবদান নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ গদ্য রচনা করা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত কাজের জন্য অক্ষয় দত্তের বিশেষ পরিচিতি ছিল, এই বইটিতে তার কোনও বিশেষ উল্লেখ নেই।

বাংলাদেশের মুক্তচিন্তক অধ্যাপক মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট (পিএইচ. ডি.) ডিগ্রি পেয়েছেন অক্ষয় দত্তের উপর গবেষণা করে। তাঁর গবেষণাপত্রটি তিনি পরিমার্জন করে *'অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা'* নামে প্রকাশ করেছেন ২০০৯ খ্রিঃ। দত্ত প্রসঙ্গে এত বিস্তৃত রচনা অন্য কোনও গবেষক এখনও পর্যন্ত (২০২৩ সাল) করেননি। কিন্তু তাঁর গবেষণাপত্রে যে বিষয়টির অনুপস্থিতি লক্ষণীয়, তা হল অক্ষয় দত্তের শ্রেষ্ঠ রচনা, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* বইটির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। বিস্তৃতির দিক থেকে অধ্যাপক সাইফুলের বইটির সাথে বর্তমান গবেষকের গবেষণা সন্দর্ভের আকস্মিক মিল থাকলেও অধ্যাপক সাইফুল-এর গ্রন্থটির সাথে বর্তমান সন্দর্ভের মূল বিষয়গত অনেকগুলি পার্থক্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল অক্ষয় দত্তের মতাদর্শের পরিবর্তন বিচারে এই গ্রন্থটিকে (ভা উ-স) সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান। অক্ষয় দত্ত রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিকেও মতাদর্শ পরিবর্তনের বিচারে আলোচনা করা হয়েছে, যা এই সন্দর্ভের একটি অন্যতম স্তম্ভ।

তিন, অক্ষয় দত্ত প্রসঙ্গে বিভিন্ন নিবন্ধকারের অনেক রচনা আমরা দেখতে পাই। অসিত কুমার ভট্টাচার্য-এর *'অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা'* (২০০৭) গ্রন্থে আটটি প্রবন্ধের মাধ্যমে উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে দত্তের ধর্ম ও সমাজ ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অক্ষয় দত্তের ধর্ম ও সমাজ ভাবনা নিয়ে আলোচনাকে অক্ষয় দত্তের বিপুল রচনাবলী ও কর্মকাণ্ডের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের অভাব সচেতন গবেষকের চোখে পরে। অক্ষয়ের রচনাবলী নিয়ে কোন আলোচনার অভাব স্বভাবতই এক অপূর্ণতার জন্ম দিয়েছে। ফলে গ্রন্থটির আলোচনা অসম্পূর্ণ বলা সঙ্গত।

আশীষ লাহিড়ী প্রণীত *'অক্ষয়কুমার দত্ত: আঁধার রাতে একলা পথিক'* (২০০৭) গ্রন্থে কেন অক্ষয় দত্ত তাঁর সময়ের এক অনন্য চরিত্র এবং এদেশে মাতৃভাষায় (বাংলা ভাষায়) বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ ছিলেন তা তুলে ধরেছেন। এই রচনাটি মূল্যবান হলেও গ্রন্থটিতে দত্তের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর চিন্তাভাবনা ও রচনাবলীর উপর ভিত্তি করে কোনও সম্পূর্ণ আলোচনা এতে নেই। বিজ্ঞান লেখক অশোক মুখোপাধ্যায় *'ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত'* (২০১৩)-এ বাংলার নবজাগরণ পর্বে ডিরোজিও এবং অক্ষয়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি এদেশের মানুষের উদাসীনতার কথা লিখেছেন। তাঁর রচনায় শ্রী মুখোপাধ্যায় দত্তের জীবনের চিন্তা জগতের বিবর্তনটি তুলে ধরেছেন। এমনকি তিনি *"ভা উ-স"*-এর ঐতিহাসিক মূল্যায়নও করেছেন। কিন্তু স্বল্প পরিসরের কারণে তিনি স্বভাবতই অক্ষয়ের সার্বিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পারেননি।

অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর রচিত *'On the Bengal Renaissance'* গ্রন্থে ভারতে রেনেসাঁসের যুগ বিভাগের উল্লেখ করতে গিয়ে অক্ষয় দত্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ভা উ-স'-এরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এর বেশি আলোচনা করেননি। অশোক সেন *'Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones'* গ্রন্থে অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে প্রায় কিছুই উল্লেখ করেননি। যতটুকু আলোচনা করেছেন তাও বিদ্যাসাগরের প্রেক্ষিতে। অধ্যাপক অমিয় সেন তাঁর *'Explorations in Modern Bengal c. 1800-1900: Essays on Religion, History and Culture'* গ্রন্থে অক্ষয় দত্তের দর্শন চিন্তা, ধর্মীয় মত নিয়ে স্বল্প পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এবং তিনি অক্ষয়ের রচনাগুলিরও উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী রচিত *'Local Selfhood, Global Turns: Akshay Kumar Dutta and Bengali Intellectual History in the Nineteenth Century'* বইয়ে দত্তের প্রেক্ষিতে স্থানীয়ের সাথে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়টি কানেক্ট করে তিনি এক নতুন বিষয় অবতারণা করেছেন। আসলে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান/ধারণা অক্ষয়ের জ্ঞান স্পৃহার প্রতি আগ্রহকে প্রমাণ করেছে। তিনি দত্তকে "Science Worker" হিসেবে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে এক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি "তত্ত্ববোধিনী পিরিয়ড" বললেও সেই পিরিয়ডে তাঁর কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ নেই, এবং ঐ পিরিয়ডের আগের বিদ্যাদর্শন পত্রিকার সময়কাল নিয়েও কিছু বলেননি। তাছাড়া ব্রাহ্মধর্মকে সংস্কারের কেন প্রয়োজন পড়ল ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি উল্লেখ করেননি। বর্তমান গবেষক এই গবেষণা সন্দর্ভে এই সবকিছুর উল্লেখ করেছেন।

এই সব কারণে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অক্ষয় দত্তের এক সার্বিক মূল্যায়নের পাশাপাশি তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তনের একটি পথরেখা অঙ্কনের কাজটি বাকি রয়ে গেছে। বর্তমান সন্দর্ভ সেই ফাঁক পূরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন হিসেবেই উপস্থাপনা করা হচ্ছে। এবং এভাবেই অক্ষয় দত্তকে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক রূপে আমরা পাব। এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়ই হল দত্তের কাজ-রচনাবলী থেকে তাঁর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা তাঁকে কতটা জানতে বুঝতে পারছি।

তাঁর শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (চিন্তা-দর্শন) আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রবন্ধের উপযোগী বাংলা ভাষা নির্মাণ করেছেন, যথাযথ যতি চিহ্নের প্রবর্তক, সমাজে বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছেন, পাঠ্যপ্রণালী-পাঠদানপ্রণালী নির্মাণ করেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের পুরোটা কোন গবেষকই আলোচনা করেননি। আসলে তাঁর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কালকে খণ্ড না করে একে ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা উচিত।

(গ) গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায়গুলি

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে অক্ষয় দত্ত কেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক তার উল্লেখ রয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর জীবন দর্শন পরিবর্তনের দিক নির্দেশও রয়েছে। জীবনের মধ্যভাগে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে 'ব্রহ্মবাদী' হয়েছিলেন। এরপর তিনি সংশয়বাদী হন এবং সর্বশেষে নিরীশ্বরবাদী। তাঁর জীবনের এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যায়গুলি ঘটনা পরম্পরায় (Chronologically) দেখান হয়েছে সন্দর্ভের অধ্যায়গুলি জুড়ে। এবং তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দুই খণ্ড) তাঁর জীবন দর্শন পরিবর্তনের সাক্ষী। এই গ্রন্থটি মূল্যায়নের মাধ্যমে এই গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি যেমন ভাবে ভাগ করা হয়েছে—শুরুতে পারিভাষিক শব্দাবলি রয়েছে। তারপর *ভূমিকায়* গবেষণার বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। *প্রথম অধ্যায়ে* 'ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন দিক'-এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন ঔপনিবেশিক নীতির উল্লেখের পাশাপাশি অক্ষয় দত্তের একটি ছোট্ট জীবনী পরিবেশনের মাধ্যমে ব্যক্তি অক্ষয় দত্তকে তাঁর সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলার নবজাগরণ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা আছে। *দ্বিতীয় অধ্যায়ে* 'শিক্ষাবিদ অক্ষয়কুমার

দত্ত''-এর শিক্ষাচিন্তা ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করার পাশাপাশি সেগুলির সামান্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর 'পত্রিকা সম্পাদনা'-এর সময়কার বিভিন্ন রচনাবলীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন–(এক) *"বিদ্যাদর্শন"* পত্রিকাটি মাত্র ৬ মাসের জন্য এবং (দুই) *"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"* ১২ বছরের জন্য। *চতুর্থ অধ্যায়ে* তাঁর ব্রহ্মবাদী থেকে নিরীশ্বরবাদী হওয়ার প্রেক্ষাপট, পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হয়েছে। *পঞ্চম অধ্যায়ে* তাঁর লেখা *'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'* গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে কোন গবেষকই বেশি কিছু আলোচনা করেননি। উপসংহার, সংযোজনী এবং গ্রন্থপঞ্জি দিয়ে গবেষণাপত্রটি শেষ হয়েছে।

(ঘ) গবেষণা-প্রণালী

বর্তমান গবেষক এই গবেষণা পত্রটির জন্য প্রধানত অক্ষয় দত্তের বিভিন্ন রচনার উপর নির্ভর করেছেন। কারণ তাঁর রচনাবলীই হল তাঁর কর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামান্য উপাদান/আকর। তাঁর চিন্তা, লেখা, কাজ সব একই সরলরেখায় রয়েছে। অর্থাৎ যেমন চিন্তা-ভাবনা তেমন কাজ। তাই উনিশ শতকের একজন চিন্তক-সমাজ সংস্কারক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তিনি বাংলার দর্শন-চিন্তা জগতে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন।

অক্ষয়ের প্রায় প্রতিটি রচনাই ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের জন্য। এগুলিকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ধরা যেতে পারে। এবং মহেন্দ্রনাথ রচিত জীবনীটি ও নকুড়চন্দ্রের লেখা বইটি রয়েছে। এছাড়া উনিশ শতকের বাংলা বিষয়ক এবং অক্ষয়ের উপর পরবর্তীকালের প্রবন্ধকারদের বিভিন্ন রচনা (বই-প্রবন্ধ) গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি অনেকাংশে লোকপ্রিয় ও নন-অ্যাকাডেমিক। সর্বোপরি, তাঁর উপর প্রকাশিত দুটি গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ হয়েছে—ড. নবেন্দু সেন ও ড. মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের।

অক্ষয় দত্তের রচনা ও উনিশ শতকের উপর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি বর্তমান গবেষকের এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রাথমিক উপাদান। বাকি রচনাগুলি গৌণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এই গবেষণা সন্দর্ভটি লেখার জন্য বর্তমান গবেষক এই দুই ধরণের উপাদানকেই গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে, কোনরকম সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র গবেষণা (ফিল্ড রিসার্চ) ইত্যাদি বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটির জন্য প্রয়োজন হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী, কলকাতায় সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স-এর গ্রন্থাগার, অনলাইন ফ্রি বুক স্টোর থেকে অক্ষয়ের বিভিন্ন রচনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন দিক

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার তৎকালীন তরুণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির 'নামমাত্র যুদ্ধ' (পলাশীর যুদ্ধ)-এ জয়লাভ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করেছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন পলাশীর যুদ্ধ ভারতের ভাগ্যে অন্ধকারময়ী চির রাত্রির সূচনা করেছিল।

(ক) ঔপনিবেশিক বাংলা ও অক্ষয়কুমার দত্তের অবস্থান

ক. ক. ক. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলা ভাষার অবস্থা-

অক্ষয়ের পূর্বের বাংলা ভাষা গ্রাম্য বর্বরতার সাথে তুল্য ছিল। তাত্ত্বিক রচনার উপযুক্ত বাংলা তখনও ছিল না।

ক. ক. খ. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলার সামাজিক অবস্থা-

ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবার্ট ট্রেভার্স যুক্তি দিয়েছেন যে ১৭৫৭-৯৩ সালের মধ্যে, ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ আধিকারিকরা ভারতের রাজনৈতিক অতীতকে বোঝার ও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল, বিশৃঙ্খল 'আঞ্চলিক প্রশাসকদের' সাথে কিছুটা সঙ্গতি এবং স্থিতাবস্থা বজায় রেখে।

ক. ক. গ. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলার সামাজিক আন্দোলন-

ব্রিটিশরা ভারতীয়দের জন্য শিক্ষা ও সামাজিক নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা স্থাপন করে *কলকাতা মাদ্রাসা* (১৭৮১ সাল), *এশিয়াটিক সোসাইটি* (১৭৮৪ সাল) এবং *বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ* (১৭৯৪ সাল)। এই সব প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্রচর্চাই করা হত এবং প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার উন্নয়ন ঘটানোও ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ১৮৩৩ সালের 'সনদ আইনের' মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা বলা হয়। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ১৮৩৫ সালে তাঁর বিখ্যাত *শিক্ষা বিষয়ক কার্যবিবরণী* (Education Minute) প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার কথা জোরের সঙ্গে বলেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে *সতীপ্রথা* (৪ই ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রিঃ) ও *শিশুহত্যা বন্ধ* করেন।

ক. খ. ক. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলা ভাষার অবস্থা-

আধুনিক বাংলা ভাষার উদ্ভব সেই সময়েই। বিজ্ঞান-দর্শন রচনার উপযুক্ত বাংলা ভাষার সৃষ্টি তখনই হয়েছিল। যদিও রামমোহন রায়ের রচনার মধ্যে দিয়ে এর সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিষয়ের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ক. খ. খ. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলার সামাজিক অবস্থা-

উনিশ শতকের বাংলা ছিল কুসংস্কারের নিগড়ে নিমজ্জিত, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। এর পাশাপাশি এই সময়েই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনে নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে—'পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।' অক্ষয় দত্ত ছিল এর বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ঔপনিবেশিক যুগে এই শ্রেণী ছিল সর্বাগ্রগণ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের উদার, প্রতিবাদী-যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা তাদের প্রতিবাদের বিষয় ছিল।

ক. খ. গ. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলার সামাজিক আন্দোলন-

এই সময় হিন্দু সমাজের পুনরুদ্ধার ও সংস্কার দুই-ই দেখা যায়। যারা পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। এঁরা হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল। হিন্দু ধর্মের ক্ষতি করেছে মুসলিম শাসকরা ও ঔপনিবেশিক শাসকরা একথা তাঁরা বলতেন। এবং এই পুনরুদ্ধার করে তাঁরা নিজেদের (হিন্দু) শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, সংস্কারবাদীরা হিন্দু ধর্মের মধ্যে যা যুক্তিসম্মত তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এবং হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য তার বিদেশী শাসক ব্রিটিশদেরও সাহায্য নিতে পিছপা হননি।

ক. গ. ক. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলা ভাষার অবস্থা-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শৈশবে আধুনিক বাংলা ভাষাকে পেয়েছেন। কিন্তু এই ভাষার অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন, *'আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল।'* গবেষকরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ এর বেশি আর কিছু না বলায় অক্ষয় দত্ত জনমানসে প্রচার পায়নি।

ক. গ. খ. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলার সামাজিক অবস্থা-

অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর (১৮৮৬ সাল) পরবর্তী সময়ের বাংলার সামাজিক অবস্থা যথেষ্টই উন্নতির স্তরে ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তথাকথিত এই সভ্য সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে কার্মাট্যাঁরে চলে যান। এই সময়কার বাংলার সামাজিক উন্নয়ন ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছে। এই সামাজিক স্থিতি, উন্নয়নের অন্যতম কারণ ছিল—কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী বলে।

ক. গ. গ. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলার সামাজিক আন্দোলন-

ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলন শুরু হয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্যে দিয়ে। *ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত) এরকম

একটি রাজনৈতিক দল। কংগ্রেসি চরমপন্থি গোষ্ঠীর উদ্ভব বাংলা থেকেই হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১১) সময় এক উত্তাল বাংলা আমরা দেখতে পাই।

(খ) উনিশ শতকের বাংলার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও নবজাগরণ(?)

উনিশ শতক জুড়ে আমরা দেখতে পাব ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা প্রভাবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সমাজ সংস্কারের পক্ষে এক বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। যার নেতৃত্বে ছিলেন রামমোহন-ডিরোজিও-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-রা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিভিন্ন ভাষায় বুৎপত্তি সম্পন্ন রামমোহন রায় ছিলেন ঔপনিবেশিক বাংলার প্রথম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বলেছিলেন। রামমোহনের রচিত তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদ্দিন (Tuhfat-ul-Muwahhiddin) [১৮০৩/০৪ সাল]-এ এর পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন *'সতীদাহ প্রথা'*র (রদ ১৮২৯ সাল) বিরুদ্ধে এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ভারতীয়দের কিরকম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে তিনি লর্ড আর্মহাস্টকে চিঠি লিখেছিলেন।

এই সময়ই একজন তরুণ শিক্ষকের আবির্ভাব হয়, যিনি সবরকম ধর্মীয় জড়তা-কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান দ্য রোজারিও (১৮০৯-৩১ সাল)। যে ডিরোজিও নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন ও তাঁর ছাত্ররা *"ইয়ং বেঙ্গলী"* নামে পরিচিত ছিলেন। শিবনারায়ণ রায় (১৯২১-২০০৮ সাল) বলেছেন, ধর্মতলা অ্যাকাডেমির দার্শনিক শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড এবং তাঁরই প্রিয় ছাত্র হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও—এই দুই আদর্শ শিক্ষকের প্রভাবে এবং ডিরোজিও শিষ্য *'ইয়ং বেঙ্গল'* তরুণদের উদ্যোগে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে যে নৈতিক-বৌদ্ধিক রূপান্তরের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমারের চারিত্রিক বিকাশে তারা সহায়ক হয়। ডিরোজিও 'পার্থেনন' পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, কিন্তু দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। দুরারোগ্য কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু ডিরোজিও-এর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি দেখে সুরেশ চন্দ্র মৈত্র লিখেছিলেন, "নিজের মুক্তি নয়, দেশের মুক্তিই হল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।"

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা অক্ষয় দত্তকে দেখতে পাই। তিনি ডিরোজিও-এর মতন বললেন, *Truth is the goal, reason is the way.* অক্ষয়ের যুক্তিবাদী কথাগুলি বৈজ্ঞানিক ধারার আধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কোন ধর্মীয় শাস্ত্রকে গুরুত্ব দেননি, এর কোন ফাঁক পূরণেরও দায়িত্ব নেননি। যা সত্য, যুক্তি-বিজ্ঞানের পক্ষে তাই বলেছেন ও মেনেছেন। সমসাময়িককালে

আর একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অক্ষয় ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যেমন গভীর বন্ধুত্ব ছিল ঠিক তেমন তাঁরা একত্রে তাত্ত্বিক লড়াই করেছিলেন উনিশ শতক জুড়ে। ইতালিয় রেনেশাঁস (Renaissance)-এর অর্থ *"নবজাগরণ"*। নবজাগরণ মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকে জ্ঞানদীপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি, পাশ্চাত্যের প্রভাব ইত্যাদি বাংলার ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

যদুনাথ সরকার এই ভারতীয় জাগরণকে ইউরোপের থেকে বেশি সুদূরপ্রসারী, গভীর ও বৈপ্লবিক বলেছেন এবং একেই নবজাগরণ বলেছেন। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার, অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত-রাও একে নবজাগরণ বলেছেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী-রা নবযুগের কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, ইউরোপীয় নবজাগরণের সাথে ভারতীয় নবজাগরণের কোন তুলনা নেই। তিনি ও অশোক মিত্র এই তথাকথিত নবজাগরণকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ সাল)-এর ফলে সৃষ্ট নব্য জমিদার শ্রেণীর একটি প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরাও এই মতকে সমর্থন করেছেন। সামগ্রিকভাবে ইউরোপের নবজাগরণের সাথে আমাদের দেশের নবজাগরণের পার্থক্য থেকে গিয়েছিল।

অক্ষয় দত্ত ছিলেন রেনেশাঁর অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, চিন্তক-সমাজ সংস্কারক, কিন্তু তিনি এখনও ইতিহাসের একজন উপেক্ষিত ও প্রায় বিস্মৃত এক চরিত্র। ১৯৭০'র উত্তাল সময়ে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যখন রেনেশাঁর সমালোচনা করা হয়েছে, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভূমিকা/কাজ প্রশ্নের মুখে পরেছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সে সময় কিন্তু রেনেশাঁর সমালোচক বা সমর্থক কোন পক্ষই অক্ষয় দত্তকে ছুঁয়ে সমালোচনা বা তাঁর পিঠ চাপরাতে চায়নি। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কিছুই হয়নি। কিন্তু তিনি জন্মের ২০০ বছরের পর থেকে একটু একটু করে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন।

(গ) অক্ষয়কুমার দত্তঃ জীবনী

অক্ষয় দত্তের নাতি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অক্ষয়ের রচিত *চারুপাঠ* (তৃতীয় ভাগ) সম্পাদনা করতে গিয়ে তার ভূমিকায় (পৃ. ।৶০- ১৶০) দত্তের এক নাতিদীর্ঘ জীবনী রচনা করেছেন। অক্ষয় দত্ত ১৫ই জুলাই ১৮২০ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন নবদ্বীপের পাঁচ মাইল উত্তরে বর্ধমানের চুপী গ্রামে। তাঁর পিতা পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী দত্ত। দীর্ঘ ৩১ বছর দুরারোগ্য (শিরপীড়া) রোগে অসুস্থ থাকার পর ২৭শে মে ১৮৮৬ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: শিক্ষাবিদ অক্ষয়কুমার দত্ত

(ক) নিজের শিক্ষা

ক. ক) ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

অক্ষয় ৪ বছর বয়সেই তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা, নবগোপালকে পাঠশালায় যেতে দেখলে, তার সাথে যাওয়ার জন্য বায়না করতেন। এই সময় তিনি একদিন বলেছিলেন, "সকল ছেলের বাপ মা ছেলেকে পাঠশালে যেতে বলে, আমার মা আমাকে ঘরে থাকতে বলে।" অল্প বয়সেই তাঁর বুদ্ধিশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

ক. খ) কলকাতায় আসার আগের শিক্ষা

তিনি ছোটবেলায় বাড়িতে পড়াশুনা করেছিলেন গুরুচরণ সরকার নামে জনৈক গুরুমহাশয়ের কাছে। আমিউদ্দীন নামে একজন মুন্সীর কাছে তাঁর ফার্সি (ভাষা) শিক্ষা আরম্ভ হয়। এছাড়া টোলে পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ও গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের (ভট্টাচার্য্যের) কাছে সংস্কৃত পড়েছেন।

ক. গ) কলকাতায় পড়তে আসা

অক্ষয় দত্তের বয়স যখন প্রায় ৯ বছর, তখন ইংরাজি শেখানোর জন্য তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা হরমোহন তাঁকে (কলকাতার) খিদিরপুরে নিয়ে আসেন। সেখানে জয় মাষ্টারের (জয়কৃষ্ণ সরকার) কাছে হরমোহন অক্ষয়কে ইংরাজি পড়তে দেন। তার কাছে পড়ে সন্তুষ্ট না হয়ে অক্ষয় নিজেই একজন (খ্রিষ্টান) পাদ্রির কাছে পড়তে যান। পাদ্রির সংস্পর্শে থাকলে অক্ষয় খ্রিষ্টান হয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় হরমোহন তাঁকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে তার নিজের অফিসের জনৈক কেরানির কাছে ইংরেজি পড়ানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন।

১৮২৯ সালে গৌরমোহন আঢ্য কলকাতায় ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি (স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল (খ্রিষ্টান) মিশনারিদের প্রভাব মুক্ত হয়ে ভারতীয় ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করা। হরমোহন অক্ষয় দত্তকে এই স্কুলে (বর্তমান সময়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে) ভর্তি করান। হার্ডম্যান জেফ্রয় নামে একজন ইংরেজ তখন ঐ স্কুলের গণ্যমান্য শিক্ষক ছিলেন। অক্ষয় দত্ত সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা শিখতে যেতেন। সেখানে শিক্ষালাভ করে অক্ষয় ইলিয়ড, ভার্জিল, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ স্তরের গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল বই প্রায় বিনা সাহায্যেই পড়তে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এইসব পড়ায় প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর সন্দেহ জন্মায়। এসব তাঁর চিন্তার ভিত্তি দৃঢ় করেছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনা থেকে পত্রিকা সম্পাদক হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

রচনার ভিত্তি ভূমি এখান থেকেই শুরু হয়েছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। যা তাঁকে বাংলার প্রথম 'বিজ্ঞান লেখক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ক. ঘ) পিতার মৃত্যুঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে বাধা

তিনি ১৯ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। তখন হরমোহন তাঁর পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নিতে চাইলেও তিনি মাতার ইচ্ছায় নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ত্যাগ করে কাজের খোঁজ করতে থাকেন। ওরিয়েন্ট্যাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী (বর্তমান অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেও বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেননি।

তিনি অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার জন্যও সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। কলকাতায় নতুন প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে (১৮৩৫ সাল) তিনি সময় পেলেই ক্লাস করতে যেতেন। এছাড়া রসায়ন, জীববিদ্যার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। সর্বোপরি, তিনি শোভাবাজার রাজবাড়ির সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। *'যতদিন জীবন ততদিন শিক্ষা (education ends with life)'*—এই সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন।

(খ) শিক্ষকতা

খ. ক) *তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়* শিক্ষকতা

তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল *'শিখব ও শেখাব'*। ১৮৪০ সালের জুন মাসে *'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'* স্থাপিত হলে (এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ছাত্রদের খ্রিষ্টান মিশনারিদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পরিবর্তে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এবং তাদের খ্রিষ্টান প্রভাব মুক্ত রাখা) তিনি ৮ টাকা মাসিক বেতনে সেই পাঠশালায় শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। ঐ পাঠশালায় তিনি বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা—এই দুই বিষয়েও শিক্ষাদান করতেন।

খ. খ) শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে

৬ই জুলাই (মতান্তরে ১৭ই জুলাই) ১৮৫৫ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য *'শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুল'* স্থাপিত হয়। তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দেন। তিনি শিরোরোগের (মাথার যন্ত্রণা) জন্য দীর্ঘকাল সেই পদে থেকে কাজ করতে পারেননি। শেষে ১৮৫৮ সালের অগাস্ট মাসে তিনি ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(গ) তাঁর শিক্ষা ভাবনা

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, *বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আপনার ও অন্যের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা কর্তব্য।*

অক্ষয় দত্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (চন্দ্রকুমার)-কে মুখোমুখি বসিয়ে একটি ছোট মাটির গুলি (ভাঁটা) 'ক' বলে পুত্রের দিকে, পুত্র পাওয়া মাত্র 'খ' বলে সেটি পিতার দিকে ছুঁড়ে দিতেন। এই ভাবে সমস্ত বর্ণ খেলার ছলে অবলীলাক্রমে অভ্যস্ত হত। পরে অক্ষর পরিচয় দেওয়া হত। তাই একদম শৈশবে শিক্ষার্থীর প্রথমে অক্ষর ও শব্দ পরিচয় করানোর চেয়ে চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের পদার্থগুলির সাথে পরিচয় করানো বেশি উপকারী বলে মনে করতেন।

যে যে বিষয়গুলি অভ্যাস ও আলোচনা করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন সেগুলি হল, (১) ভাষা শিক্ষার উপযোগী বই পড়া এবং বর্ণমালা শেখা ও লিখতে পারা; কেননা এই তিনটি বিষয় জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করার প্রধান উপায়, (২) পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্তব্য; কেননা জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা পড়তে হলে, গণিতবিদ্যা আবশ্যক। গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষ ও শিল্পবিদ্যাদি পড়ার এক প্রধান সিঁড়ি, (৩) ভূগোল, (৪) প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, (৫) রসায়ন, (৬) শারীরস্থান ও শারীরবিধান, (৭) পদার্থবিদ্যা, (৮) পুরাবৃত্ত, (৯) লোকযাত্রাবিধান (Political Economy), (১০) মনোবিদ্যা ও ধর্মনীতি, (১১) পরমার্থবিদ্যা, (১২) সাহিত্য, (১৩) চিত্রবিদ্যা-শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি। তাঁর এই বিষয়সূচি আমাদের সহজেই ধারণা দেয় যে, তিনি এই পাঠ্যসূচী নির্ধারণের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ভাবনার সূচনা করেন। বিষয়গুলি পাল্টে গেলেও আজও এগুলি পড়ানো হয়।

অক্ষয় দত্তের শিক্ষা ভাবনার প্রতি নজর দিলে খুব সহজেই কয়েকটি মূলসূত্র আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান; দ্বিতীয়ত, এমন শিক্ষা চাই যাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ হয়; তৃতীয়ত, সেই জ্ঞানের শিক্ষা কল্যাণকর, যা বিশ্বমানবমনের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন করে, কিন্তু সে যোগ অবশ্যই সকলস্তরের মানুষের জন্যেই কাম্য; চতুর্থত, শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সমুন্নত ধারণা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য; পঞ্চমত, সেই শিক্ষা বাঞ্ছনীয় যা শিক্ষার্থীকে আধুনিক বিশ্বচিত্তের সঙ্গে স্বাজাত্যবোধকে মিলিয়ে নিতে সহায়তা করে। .....এছাড়া, তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সকল স্তরের তথা, অফিস-আদালত এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা বাংলা চালু করা দরকার।

(ঘ) নারী শিক্ষা

তৎকালীন সময়ে বাংলায় নারী শিক্ষার হার ছিল একদম নগণ্য। নারী শিক্ষা আন্দোলনে অক্ষয় ও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল চিরস্মরণীয়। অক্ষয় লিখেছেন, অনেক আগে ভারতবর্ষের স্ত্রীদের পড়াশুনার রীতি প্রচলিত ছিল তার সন্দেহ নেই। নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ছিল, জনসমাজের অনেক মঙ্গল নারীদের সুশিক্ষা লাভের উপর নির্ভর করে।

(ঙ) পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁর অবদান-অনন্যতা

তিনি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় যখন পড়াতেন তখনও বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্য বই ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ সাল) ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৮ সাল)-এর তৈরি করা পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন পাঠ্য বই ছিল না। তাই তিনি পাঠ্য বই লিখতে হাত পাকালেন। তিনি বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় *"ভূগোল"* বই লিখলেন (১৮৪১ সাল), পাশাপাশি পরিভাষাও নির্মাণ করলেন। এরপর তিনি রচনা করেন, পাঠ্যপুস্তক— *"চারুপাঠ"*, তিনটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ড ১৮৫৩ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৬ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় এই সময়েই (১৮৫৬ সাল) তিনি লেখেন আরও দুটি পুস্তক— *"ধর্ম্মনীতি"* এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য *"পদার্থবিদ্যা"*।

তাঁর রচিত ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বই। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন প্রাকৃতিক ভূগোল প্রসঙ্গে পুরাণ বা কাল্পনিক গাথা শুনেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য (বিজ্ঞান) শিক্ষা তাঁর সেই ভুল ভাঙ্গাতে সাহায্য করেছিল, যার প্রতিফলন আমরা তাঁর লেখা এই পাঠ্য গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাই। এই বিষয়ে তিনি একক কৃতিত্বের অধিকারী। ভূগোল বইয়ের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, *".....দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালক দিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষা যোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।....."* অক্ষয় দত্ত রচিত ভূগোলের পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত ভূগোল গ্রন্থগুলি ছিল বর্ণনামূলক। দত্তই প্রথমে (ক) প্রাকৃতিক ভূগোলের ধারণা আমদানি করেন, (খ) শিক্ষার্থীদেরকে এশিয়া মহাদেশের সাথে অন্যান্য মহাদেশগুলিও পরিচয় করান, (গ) গ্রন্থে পৃথিবীর একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র ছিল, (ঘ) প্রকৃতি বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দেন। এবং এই তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। যা ভূগোল বিষয়কে integrated subject হিসেবে সৃষ্টি করে।

তিনি *চারুপাঠে* সম্পূর্ণ নিজের পছন্দমত বিষয়ে শিশুদের উপযোগী করে বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। চারুপাঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের নাম পত্রে (Title Page) লেখা আছে—*"ENTERTAINING LESSONS in SCIENCE AND LITERATURE".* তিনি চারুপাঠের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, *"চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ যে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটি প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত (প্রকাশিত) হয়। অবশিষ্ট কয়েকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।"* চারুপাঠ প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯ সাল) বলেন যে, নানা ভাগে এই বই থেকে সেকালের বাঙালির মানসিক শিক্ষা আরম্ভ হতো।

তিনি পদার্থবিদ্যা নামের সঙ্গে যোগ করেন *"জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম"*। এই বইটির গোড়াতে (বিজ্ঞাপন) তিনি জানাচ্ছেন, "এই পুস্তক প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। চেম্বর্স ও আর্ণট প্রভৃতি ইঙ্গরেজি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াছে। .....গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত অভিনব বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমুদায়ের ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী এতাদৃশ কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই বলিয়া ইহাকে এই অবস্থাতেই প্রচার করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া তাহাদিগের (ছাত্রগণের) পদার্থবিদ্যায় অনুরাগমাত্র জন্মিলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।....."

(চ) বাংলা ভাষার 'যথার্থ শিল্পী'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, অক্ষয়কুমারের ভাষা "বিদ্যাসাগরের পূর্বে, 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতার' হস্ত হইতে আপনাকে নির্মুক্ত করিয়াছিল।" তিনি বাংলা ভাষার অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে লিখেছেন—প্রথম প্রতিবন্ধকতা হল, শিক্ষিত বাঙ্গালিদের দ্বারা বেশি বেশি করে ইংরেজি ভাষার চর্চা ও আলোচনা (করা), এবং বাংলা ভাষা অনুশীলনে (তাদের) অবহেলা এবং নিজের ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হল, বাঙ্গালিদের স্বাধীনতাশূন্যতা। যিনি প্রভু, তাঁর ভাষাও প্রভুত্বব্যঞ্জক। যে দাস তার ভাষাও দাসত্বব্যঞ্জক।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অক্ষয় ও বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে আধুনিক, দৃঢ় সংবদ্ধ ও দার্শনিক আলোচনার যোগ্য বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাঁরা বাংলা ভাষাতে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য প্রদান করেছেন। এই কারণে বাংলা ভাষা তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁদের আগে বাংলা ভাষা তেজহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনার উপযোগী ছিল;

অশ্লীল কবিতা, পাঁচালী ও পদ্যই তখন বেশি ব্যবহৃত হত। তাঁরাই ভাষার সংকীর্ণতা ও অভাব দূর করেন। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্তি বিরাজ করবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, পুরাবৃত্তদের সমুদ্র থেকে অনেক পরিশ্রমে তিনি মহামূল্য মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে তাকে সাজিয়ে গেছেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে চাই উপযুক্ত এবং বিভ্রান্তিহীন পরিভাষা, এবং প্রবন্ধের উপযোগী ভাষার কাঠামো ও বিন্যাস, যার মাধ্যমে অনায়াসে গদ্য সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার প্রাথমিক দায়িত্ব যথাযথ ও নির্ভুল হওয়া, এর পরে আসে তার সরল ও মনোগ্রাহী উপস্থাপনা। এই কাজ সুষ্ঠ পদ্ধতিতে করার জন্য চাই যতি চিহ্নের ব্যবহার, যে বিষয়টি সেকালের পয়ার ছন্দে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক এক উপাদান ছিল না। তখন তিনি প্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার শুরু করলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে ধার করে।

(ছ) *যতিচিহ্নের* প্রবর্তক

গদ্য রচনার উপযুক্ত বাংলা ভাষাই শুধু নয়, অক্ষয় দত্ত রচনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলা সাহিত্যে 'যতিচিহ্ন'-এর প্রবর্তন করেছিলেন। অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, *"আধুনিক রীতির গদ্য বাক-ধারা নির্মাণে তাঁর (অক্ষয় দত্ত) সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইংরাজি থেকে যতিচিহ্ন আত্মসাৎ করে তাদের বাংলা ভাষার কোলে-কাঁখে গুঁজে দেওয়া। পূর্ণচ্ছেদ যতিচিহ্ন হিসাবে দাঁড়ির ব্যবহার আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত শ্লোকের এক দাঁড়ি দুই দাঁড়ি গ্রহণ করে। বাকিগুলি, অর্থাৎ, কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), হাইফেন (-), ড্যাশ (--), প্রশ্নবোধক-চিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), উহ্যবাচক ঊর্ধব কমা (‘), দুরকম উদ্ধৃতি-চিহ্ন (“ এবং ”), তিন রকমের বন্ধনী (() {} []), অনুক্তিবাচক বহু ডট (.....), ইত্যাদি এমনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন যে আজ এগুলি যে বাংলা ভাষার ভেতরে এক কালের আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি তা বলে না দিলে আর বোঝার কোনো উপায় নেই।"*

কিন্তু অক্ষয়ের পরিবর্তে বিদ্যাসাগরকেই সকলেই 'যতিচিহ্নের পথিকৃৎ' মনে করেন। বিদ্যাসাগর প্রথম এই ধরনের সুসংগঠিত বাংলায় লেখেন *'বেতাল পঞ্চবিংশতি'* তে, যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। শিশিরকুমার দাশ তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম মুদ্রণে একমাত্র দাঁড়ি ছাড়া অপর কোনো চিহ্ন ছিল না। এমনকি দ্বিতীয় সংস্করণেও শুধু দাঁড়িই লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগর নিজে বলেছেন, 'বেতালপঞ্চবিংশতি দশমবার প্রচারিত হইল। এই পুস্তক, এতদিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল;

সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই।....." পক্ষান্তরে অক্ষয় দত্তের ১৮৪১ সালে রচিত 'ভূগোল' গ্রন্থেই আধুনিক যতি চিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর ১৮৪৫ সালের *'শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা'* যখন প্রকাশিত হয় তখনও যতিচিহ্ন দেখা গেছে।

(জ) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজন *প্রশংসিত 'পাখী সব করে রব'* কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা

অক্ষয় দত্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের *'পাখী সব করে রব'* কবিতার মাধুর্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেও বলেছেন, "....কিন্তু প্রভাত বর্ণনটি প্রকৃত স্বভাব বর্ণনা নয়; প্রত্যুত, স্বভাবের বিরুদ্ধ বর্ণনা।" তাই কবিতাটির পংক্তি ধরে ধরে তিনি সাহিত্যিক সমালোচনা করেছিলেন। মদনমোহনের এই কবিতা তৎকালীন সময়ে শিশু পাঠ্য ছিল, তাই তিনি চেয়েছিলেন এই মারাত্মক ভুলের সংশোধন। অক্ষয় দ্বারা এই সমালোচনা তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদের পরিচয় বহন করে।

(ঝ) অন্যান্য বিষয়াবলীঃ গ্রন্থাগার-কৌতুকাগার, ছাত্রপ্রীতি ও শিক্ষার জন্য অনুদান (হিন্দু হোস্টেল প্রসঙ্গ/উইলে বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি)

তিনি মৃত্যুর পূর্বে উইলের মাধ্যমে তাঁর সম্পত্তির ৭ ভাগের ১ ভাগের অর্ধেক অংশ কলকাতার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভায়, অর্থাৎ Indian Association for the Cultivation of Science নামক সভায় (প্রতিষ্ঠানে) দান করেন। তিনি উইলে আরও লিখেছেন, তাঁর বিভিন্ন শিক্ষাদায়ক ও কৌতুকাবহ দ্রব্যগুলি যদি (তাঁর মনোনীত) এগজিকিউটররা তাঁর কোনও উত্তরাধিকারীকে ব্যবহার করার উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে তাঁকেই দেবেন। নতুবা, কোনও সাধারণ লোকের শিক্ষাস্থানে সেগুলি দান করবেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার (Library) স্থাপন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, এই বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন।

উনিশ শতকের বাংলা ছিল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক সেই সম্ভাবনা পূর্ণ করতে দেয়নি। বা অন্যভাবে বলা যায় তারাই সেই 'সীমিত' সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। উনিশ শতক হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষা সংক্রান্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়। সেই সময়কালে অক্ষয় দত্ত ছিলেন এই বাংলার শিক্ষা (সমাজ) সংস্কারের একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বিশেষতঃ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও সর্বজনীন বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পত্রিকা সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন রচনায় তাঁর চিন্তা-মতাদর্শ যেভাবে ফুঁটে উঠেছে, পাঠকবর্গের সাথে তার পরিচয় করানো।

(ক) গদ্য রচনার সূত্রপাত

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯ সাল) তাঁর পত্রিকা অফিসের এক কর্মী অনুপস্থিত থাকায় অক্ষয়কে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার কিছুটা অংশ গদ্যে তর্জমা করে দিতে বলেন। তাঁর গদ্য লেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না, তাই কিছুটা ইতস্ততঃ করে গুপ্ত কবির বলপূর্বক আবেদনে তিনি সেই তর্জমাটি করেছিলেন, যা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, 'যিনি সর্বদা গদ্য লিখছেন তিনিও এরকম পারবেন না!' সেই থেকে তাঁর গদ্য রচনার সূত্রপাত।

(খ) বিদ্যাদর্শন পত্রিকা

অক্ষয় দত্ত *বিদ্যাদর্শন* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৭৬৪ শকাব্দ/আষাঢ় ১২৪৯ সাল/জুন ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ), টাকিবাসী প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহায়তায় তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাটি মাত্র ৬ মাস প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেছেন—"যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তখন পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এই পরমপ্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের (বাংলার) মৃতপ্রায় (বাংলা) ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ (ইচ্ছা প্রকাশ) করিয়াছি।" মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের মতে, এই কথাগুলিই "তাঁর (অক্ষয় দত্তের) চিন্তার সুর, তাঁর মুক্ত মনকে প্রতিফলিত করে।"

খ. ক) বিদ্যাদর্শনে কী প্রকাশিত হত?

অক্ষয় দত্ত পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের আদর্শ পত্রিকার প্রত্যেকটি রচনায় সুপরিস্ফুট। বহুবিবাহ, অধিবেদন, এদেশীয় স্ত্রীলোকদের ব্যভিচারের কারণ, হিন্দু স্ত্রীদের বিদ্যাবুদ্ধির সৎ পরামর্শ, বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি রচনা তার নিদর্শন। বিদ্যাদর্শনের ২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৭৬৪ শক) *বহুবিবাহ* বিষয়ে লেখা হয়েছে—*হে কুলীন ভাত্রাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপূর্ব্বক আপনারদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্ম্মের আস্বাদ বশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর।*

সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে আইনী হস্তক্ষেপের পক্ষে 'বিদ্যাদর্শন'-এর ৩য় সংখ্যায় (ভাদ্র ১৭৬৪ শক) প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। পত্রিকার ১ সংখ্যা আষাঢ় ১৭৬৪ শকে *'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা'* শিরোনামে তাঁরা নারীদের ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্যে 'নারী শিক্ষা'র উপর জোর দিয়েছেন। অক্ষয় নারীদের শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছিলেন, তাই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও আমরা দেখতে পাই তাঁর এই বিষয়ক রচনাগুলি। ৪ সংখ্যা আশ্বিন (১৭৬৪ শক) সংখ্যায় তিনি *'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ'* শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এছাড়া তিনি আরও লিখেছিলেন *'বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব'*, কার্ত্তিক ১৭৬৪ শকে। *'স্ত্রীলোকদের বিদ্যাভ্যাস'* অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শকে।

খ. খ) বিদ্যাদর্শনের মূল্যায়ন-

বিদ্যাদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা যায়, আর্থিক অনটনই তার প্রধান কারণ ছিল। বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় তৎকালীন বাংলার নারীদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা—নারী শিক্ষা, বহুবিবাহ, কুলীন প্রথা ইত্যাদি ইস্যুগুলি নিয়ে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন অন্যান্য সমাজ সংস্কারক বা প্রাবন্ধিকদের পূর্বেই। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, নিশ্চয় তৎকালীন সময়ের এই রচনাগুলি প্রাচীন হিন্দু সমাজকে ধাক্কা দিয়েছিল।

(গ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

৬ই অক্টোবর ১৮৩৯ তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল *'তত্ত্বরঞ্জনীসভা'*। তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে একটি পত্রিকা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা) প্রকাশ করার প্রস্তাব হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *আত্মজীবনী*তে লিখেছেন, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার, রুচির বৃদ্ধি।

১৮৪৩ সালের অগাস্ট (১৭৬৩ শকের ভাদ্র) মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা একদিনেই দেশের জনগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে নিয়েছিল। অক্ষয় দত্তের চেষ্টায় এতে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বিষয়গুলিও প্রকাশিত (আলোচিত) হত। বাংলা ভাষার যে ওজস্বী, গম্ভীর রচনা সম্ভব এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই ইংরেজি ভাষার মতন বাংলা ভাষাতেও আলোচনা করা সম্ভব এই পত্রিকা, তা শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে তুলে ধরেছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে *পেপার কমিটি* (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধ নির্বাচনী সভা স্থাপন করেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ-

সভায় এই সকল গুণী, জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক আগে প্রবন্ধ মনোনীত ও আবশ্যক হলে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে তবে পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কিন্তু একসময় দেবেন্দ্রনাথ এদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন (২৬শে ফাল্গুন ১৭৭৫ শক),- "এই বক্তৃতা আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরাই তৃপ্ত হয়েছেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা একে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশের যোগ্য মনে করলেন না। কতগুলি নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হয়েছে, এদেরকে এই পদ থেকে তাড়িয়ে না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নেই।"

এই নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ বলতে দেবেন্দ্রনাথ আসলে অক্ষয় ও বিদ্যাসাগরকে বুঝিয়েছিলেন। এঁদের সাথে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ বাড়তেই থাকে (অক্ষয়ের সাথে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ পরের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, তিনি (অক্ষয় দত্ত) যা লিখতেন, তাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কেটে দিতাম ['এক এক দিন অক্ষয় বাবুর লেখা প্রস্তাবগুলি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করার আগে তা সংশোধন করতে করতে তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) গলদঘর্ম হতেন।' - রাজনারায়ণ বসু]এবং আমার মতে তাঁকে আনার চেষ্টা করতাম; কিন্তু তা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজছি, ঈশ্বরের সাথে আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজছেন, বাহ্য বস্তুর সাথে মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ;- আকাশ পাতাল প্রভেদ!

দেবেন্দ্রনাথের কথায়, 'তিনি বেশি (অধিক) বেতন দিয়ে অক্ষয় বাবুকে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত করেন।' ১৮৪৩ সালে যখন অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৩০ টাকা। যা কাজের নিরিখে "বেশি বেতন" ছিল না। এই বেতনের ব্যাপারে একজন গবেষক বলেছেনঃ "পত্রিকা সম্পাদনার কাজে সেদিন অক্ষয়কুমারের জন্য বেতন ধার্য হয়েছিল মাসে তিরিশ (৩০) টাকা। ক্রমে এই বেতন বৃদ্ধি পেয়ে পঁয়তাল্লিশ (৪৫ টাকা) হয়ে শেষে ষাটে (৬০ টাকা) পৌঁছয়। এই সময়ের অন্য একটি পত্রিকা সম্পাদকের বেতনের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য অক্ষয় দত্তের মাসিক এই অর্থ-প্রাপ্তিকে (বেতনকে) খুব 'বেশি বেতন' বলতে পারি না। ১৮৫১ সালে কলকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি থেকে মাসিক 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সম্পাদক করে। এজন্য ঐ কমিটির কাছ থেকে রাজেন্দ্রলাল মাসে আশি (৮০) টাকা (বেতন) পেতেন।'

গ. ক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কি প্রকাশিত হত?

অক্ষয় দত্ত ১২ বছর (১৮৪৩-৫৫ খ্রিঃ) এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তখন এই পত্রিকা প্রতি মাসের শুরুতেই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে আমরা পত্রিকায় সম্পাদকীয় দেখি, বা কোন প্রবন্ধটি কোন লেখকের লেখা তার উল্লেখ দেখি। কিন্তু দত্ত যখন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তখন এসবের কোনও লক্ষণ ছিল না। পত্রিকায় প্রকাশিত যেকোন লেখার দায়ভার সম্পাদককেই নিতে হত। তিনি একাধারে পেপার-কমিটির গ্রন্থ-সম্পাদক হিসেবে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, অন্যদিকে পত্রিকার জন্য লিখেছেন। বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনীর বহু লেখায় তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও সেগুলি যে তাঁর রচনা তা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। কারণ সেই সময় এরকম পারদর্শী ও গুণী লেখক খুব কমই ছিলেন এবং লেখকের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা।

এই পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়ের হাত ধরে তাতে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অক্ষয় দত্তের হাতে বাংলা গদ্য বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে আধুনিক, দৃঢ় সংঘবদ্ধ ও দার্শনিক আলোচনার যোগ্য বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অক্ষয় দত্ত এই পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

- *সামাজিক* লেখায় নারী সমস্যা-নারী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় (বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ/কৌলিন্য প্রথা) যেমন আছে, ঠিক তেমনই সুরাপানবিরোধী প্রস্তাব, কৃষকদের সমস্যা (পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন) ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা দেখতে পাব।
- *রাজনৈতিক* রচনাগুলি মূলত ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী ও খ্রিষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে।
- অন্যদিকে, *শিক্ষা সংক্রান্ত* বিষয়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক (কেন দরকার), বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এছাড়া রয়েছে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বিষয়ক রচনাগুলি, পদার্থবিদ্যা-ভূগোল-চারুপাঠ ইত্যাদি পাঠ্য পুস্তকের অংশবিশেষ। স্বদেশী ভাষায় বিদ্যাভ্যাস, বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি রচনা।
- *রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার*-এর জীবনী।
- *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের কিছু অংশ।*

কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের পক্ষে সনাতনপন্থীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে অক্ষয় দত্ত *'বিদ্যাদর্শন'*-এর ২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৬৫ শকে (১৮৪২ সাল) *'বহুবিবাহ'* শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে "বিধবা বিবাহ" আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন তৈরির জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র ১৫২ সংখ্যা চৈত্র ১৭৭৭ শকাব্দ বা ইংরাজি ১৮৫৫ সালে *'বহুবিবাহ'* প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগরের *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'* প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৫৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। তাঁর মত সমর্থন করে অক্ষয় দত্ত ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যায় তাঁর অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং জোরালো সমর্থনমূলক প্রবন্ধ—*'বিধবা বিবাহ'* প্রবন্ধটি লেখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইয়ং বেঙ্গলিদের মুখপত্র *'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'*-এ ১৮৪২ সালে বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

সমকালের এক জ্বলন্ত সমস্যা ছিল কৃষকদের সমস্যা, যা ব্রিটিশের বিরূপ হস্তক্ষেপের কারণে আরও ভয়াবহ চেহারা নেয়। অক্ষয় দত্ত সমসাময়িক এই সমস্ত বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তাঁর *'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন'* রচনাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ ১৮৫০ সাল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন—*"যে রক্ষক সেই ভক্ষক"-এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিদের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; কি জানি কখন কী উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি (ভূস্বামী) কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি (ভূস্বামী) ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথা সর্ব্বস্ব হরণে একাগ্র চিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন।"* তিনি এই কথার দ্বারা ঔপনিবেশিক বাংলার জমিদারি প্রথার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীনবন্ধু মিত্র-এর *'নীল দর্পণ'* নাটকটি (ইংরেজি তর্জমা) নিয়ে যখন বিতর্ক দেখা গিয়েছিল তখন রেভারেন্ড লঙ-এর পাশে যেসকল ব্রাহ্মরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমুখ।

তিনি রাজা রামমোহন রায়-কে *"ভারতের বন্ধু"* বলে সম্বোধন বলেছেন, *"তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হয়েছে, তা পতিত হল না, হবেও না, প্রতিনিয়ত একভাবে উড্ডীয়মান রয়েছে। আগে যে ভারতবর্ষীয়রা তোমাকে পরমশত্রু বলে জানতেন, তার সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরমবন্ধু বলে বিশ্বাস করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।"*

তিনি শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার (ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) সম্পর্কে তাঁর তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীর (১৮৪৫ সাল) স্মরণ সভায় (*হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা*) বলেছিলেন- *"ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ (কলেজ), তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন ব্যক্তি? — সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান কোন মনুষ্য? — ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন পুরুষ? — ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদযোগী কোন মহাত্মা? —ডেবিড হেয়ার সাহেব।"*

গ. খ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্যায়ন-

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের বাঙালি হৃদয় কিভাবে আলোড়িত হয়েছিল, সে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, *"তত্ত্ববোধিনী বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে দাঁড়াল। তার আগে বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রগুলির অবস্থা কি ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তা স্মরণ করলে, তাঁকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলে থাকা যায় না।"*তিনি আরও লিখেছেন, "*.....*ডিরোজিওর শিষ্যরা ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল (প্রকাশিত হল), তখন তাঁরা আনন্দিত হয়ে উঠলেন। অক্ষয় দত্ত এই কৃতিত্বের সম্পূর্ণ অধিকারী। তাঁর হাত ধরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। কি দেশী কি বিদেশী, কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান কি ব্রাহ্ম ব্যক্তি মাত্রে প্রায় সবাই এই পত্রিকার গ্রাহক হতে থাকে। যাঁদের অবস্থা কিছু খারাপ, তাঁরা সিকি বা অর্ধেক দামে পত্রিকা পাওয়ার আশায় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন।"

তাই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, *"প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উপস্থিতিতে নব বাঁড়ুয্যা একদিন তাঁকে বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর (প্রসন্ন কুমার ঠাকুর) লাইব্রেরীতে বসে এটি পড়ি; তা পড়লে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়।"*পাদ্রী লং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে লিখেছিলেন: *"To those who wish to know what the expressiveness of the Bengali language mean, we would recommend the perusal of the Tattwabodhini Patrika, a monthly publication*

in Bengali, which yields to scarce any publication in India for the ability and originality of its articles."

(ঘ) অসুস্থ অবস্থায় পত্রিকা কমিটির দান ও পরবর্তী ঘটনাবলী (পীড়া ও পত্রিকার অবনতি)

তাঁর উৎকট শিরারোগের জন্য তিনি আজীবনের জন্য তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার কাজ ও পরে নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৮৫৮ সাল)। ফলস্বরূপ তিনি আর্থিক অনটনে পরেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর উদ্যোগ নিয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে দত্তকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য। এই পত্রিকার ৩য় ভাগ ১৭১ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৭৭৯ শকে প্রকাশিত হয়-বিশেষ সভার প্রস্তাব (২৯শে ভাদ্র ১৭৭৯ শক)-*.....তদনুসারে অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সম্যক্ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রম ক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা (২৫ টাকা) মাসিক বৃত্তি পাইবেন।*

দত্ত এই সাহায্য ৫ বছর গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৫ সাল নাগাদ তাঁর বইপত্রের বিক্রি থেকে আয় বাড়তে থাকলে। তিনি তখন সভাকে এতদিন সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুরোধ করেন সেই সহায়তামূলক বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ২৩১ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৭৮৪ শকের বিজ্ঞাপনে তা উল্লেখ করা হয়।

তাঁর অসুস্থতার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন- *"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ (সাত শত) জন গ্রাহক ছিল তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদনা না করিতেন, তাহা হইলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই।"*কিন্তু পত্রিকার উন্নতি আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। তাঁর মৃত্যুতে (২৭শে মে ১৮৮৬ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছিল, *"তিনি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায় একপ্রকার নষ্ট হয়। কি ভাষা, কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী।"*

চতুর্থ অধ্যায়ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন দর্শনের পরিবর্তন

অক্ষয় দত্ত একজন সত্য সন্ধানী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞানতৃষা তাঁকে মুক্ত মানুষ হতে সাহায্য করেছিল। অক্ষয়ের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর 'জীবন দর্শনের' পরিবর্তন ঘটেছিল, যা সহজেই লক্ষণীয়। বর্তমান গবেষক এই অধ্যায়ে তাঁর জীবনের দার্শনিক পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনের প্রারম্ভে পারিবারিক উদারতা-ধর্মভীরুতার পর্ব পার করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কখনই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না, এমনকি খ্রিষ্টান প্রভাবও তেমন কাজ করেনি। তাঁর জীবন দর্শনে ইউরোপীয় চিন্তার গভীর প্রভাব ছিল। রামমোহনের আদর্শে ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি *ব্রাহ্মধর্ম* গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কখনও পৌত্তলিকতা, বেদের অভ্রান্ততা, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি মানেননি। এবং তাঁর মতামতগুলি দেবেন্দ্রনাথকে (যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে) মানতে বাধ্য করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু-রা তাঁর পক্ষাবলম্বন না করলেও তিনি মতবাদিক বিতর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন যা তাঁকে ব্রাহ্ম থেকে নিরীশ্বরবাদী হতে সাহায্য করেছিল।

(ক) ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্মসমাজ-ব্রহ্মবাদ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *"আত্মজীবনী"*তে (১৮৪৯ সাল) লিখেছেন, *'ব্রাহ্ম'* শব্দটি রাজা রামমোহন রায়ের সৃষ্টি না। সংস্কৃতে এই শব্দটি খুবই পুরানো, এবং ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বহুল ভাবে ব্যবহত। রামমোহন রায়ের সময়ে এই শব্দটি সাধারণ লোকেরা না জানলেও শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা জানতেন'। ১৮৪৭ সালের ২৮শে মে তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে, 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম'-এর পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি গ্রহণ করা হয়। ২০শে অগাস্ট ১৮২৮ সালে (মতান্তরে ১৮২৯ সাল) রামমোহন রায় 'ব্রাহ্ম-সভা' নামে একটি নতুন ধর্মীয় সমাজ প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে যা *'ব্রাহ্মসমাজ'* নামে পরিচিত হয়। এই ব্রহ্ম-সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও একেশ্বরবাদ প্রচার। .....ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র ছিল সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের উন্মেষ, মূর্তি পূজার বিরোধিতা এবং সতীদাহ প্রথার মত সামাজিক কুপ্রথাগুলির সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন।

আসলে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামমোহন পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করতে চেয়েছিলেন। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছর ডিসেম্বরে মাত্র ১৯ বছর বয়সে অক্ষয় দত্ত ঐ সভার সদস্য হন।

রামমোহনের দেশত্যাগ ও মৃত্যুর (ব্রিস্টল, ১৮৩৩ সাল) পর ব্রাহ্মসমাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পরে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। তাঁর চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ নানা স্থানে বিস্তৃত হয়। নানা নিয়মকানুন ও রীতির প্রবর্তন করে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি সংগঠিত ধর্মীয় রূপ দেন। তাঁর আমলে ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষা বিস্তার ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার দূর করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধায় ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁরা *'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'* গঠন করেন (১৮৬৬ সাল) এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ *'আদি ব্রাহ্মসমাজ'* নামে পরিচিতি লাভ করে। কয়েকটি নীতিগত প্রশ্নে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' অভ্যন্তরে প্রবল বিতণ্ডার সূচনা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্মরা ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে *'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'* প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ সালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে কেশবচন্দ্র তাঁর 'নববিধান' ঘোষণা করেন এবং তাঁর ব্রাহ্মসমাজ *'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'* নামে পরিচিত লাভ করে। কালক্রমে কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত 'নববিধান' তার প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এর নেতৃত্বেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজ চলতে থাকে।

ভারতীয় জনজীবনে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বুকে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম আঘাত হানে। নারী স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, শিক্ষা বিস্তার, হরিজন উন্নয়ন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ, মদ্যপান নিবারণ, পর্দাপ্রথা রদ প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই ইংরেজ শাসকরা বিখ্যাত *'তিন আইন'* (১৮৭২ সাল)[Act of 1872] পাশ করে। যার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ করা হয়। ব্রাহ্মদের আন্দোলনের ফলেই ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলি দূর হতে থাকে। তাঁরা নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য ঢাকা শহরে *ব্রাহ্ম ইডেন ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(খ) অক্ষয় দত্তের মতাদর্শ পরিবর্তনের ধাপগুলি

বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন হয়? আমাদের মতনই এই প্রশ্নের বিভিন্ন কাল্পনিক উত্তর অক্ষয় দত্ত তাঁর ছোটবেলায় শুনেছিলেন। তাঁর এই ভুল ধারণাগুলি ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি (স্কুলে)-তে জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ও ভূগোল পড়ে দূর হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে ছোটবেলা থেকে তাঁর মন যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের প্রাচীন দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি ক্রমশ অনুভব করেন যে পৌত্তলিকতা (idolatry) এবং বহুদেববাদ (polytheism) আসলে একটি অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস, যা পশ্চিমের লোকেরা খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের মধ্য দিয়ে বহুকাল আগেই কাটিয়ে উঠতে পারলেও সনাতন হিন্দু ধর্ম তা আজও পারেনি।

চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২ সাল)-এর *'অরিজিন অফ স্পিশিজ'* (১৮৫৯ সাল) বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞান গবেষক আশীষ লাহিড়ী লিখেছেন, ১৮৫৯ সালে ডারউইনের অরিজিন অব স্পিশিজ বেরোবার পর অনেকেরই মতো অক্ষয়েরও চিন্তাভাবনা একটা সুনির্দিষ্ট বাঁক নেয়। অল্পকালের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্বে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন তিনি। .....তিনি অবশেষে হয়ে ওঠেন অজ্ঞেয়বাদী, যাঁরা বলেন, ঈশ্বর থাকার যেমন কোনো প্রমাণ নেই, তেমনি না-থাকারও কোনো প্রমাণ নেই, সুতরাং যুক্তিশাস্ত্রের দিক থেকেও প্রশ্নটা মীমাংসার অযোগ্য। উনিশ শতকের মধ্যপর্বে ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে এ-ভাবনার সঙ্গে নাস্তিকতার প্রভেদ সামান্যই। অক্ষয়কুমার ঘোষণা করুন আর না করুন, তাঁর মধ্যবয়সে তিনি নাস্তিকই হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি জাত-পাত, জাতের মধ্যে ভেদাভেদও মানতেন না। যা এই সময়ের অন্যান্য ব্রাহ্মদের থেকে তাঁকে পৃথক করেছিল। তিনি জাতি ব্যবস্থা যে মানতেন না তার দুটি উদাহরণ দেখা যাক— *'একবার দমদমা অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময়ে পোদ নামক এক নীচ জাতির হুঁকায় তামাক লইয়া বেড়াইতে যান। প্রত্যাগমন সময়ে অন্য একটি দোকানে গিয়া, তামাক খাইতে চাহিলে মুদী বলিল-তোমাকে হুঁকা দিব না। তুমি পোদের হুঁকায় তামাক খেয়েছ, তোমার জাত নষ্ট হয়েছে। উহাতে অক্ষয়বাবু তাহাকে বলিলেন-আমি জাত মানি না।'* দ্বিতীয় ঘটনাটিও নানাদিক থেকে শিক্ষাপ্রদ। অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, *'১২৯০ সালের (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) ৭ই বৈশাখে অক্ষয়বাবুর সহিত ইঁহার গাড়িতে বেড়াইতে যাই। পথের মধ্যে একজন ধাঙ্গড়কে (মেথর) দেখিতে পাইয়া অক্ষয়বাবু গাড়ি দাঁড় করাইতে বলিলেন; এবং তাহাকে সন্নিকটে ডাকিয়া তাহাদের যাবতীয় আচার ব্যবহার ও তাহাদের দেবদেবীর পূজার্চ্চনার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।*

ক্রমশঃ আর দু-একজন ধাঙ্গড় আসিয়া জুটিল। তাহারা নিজ জাতীয় ব্যবহারাদি বর্ণন করিতে লাগিল।.....পরে অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—ইনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন, ইনি আমাদের ভেদ মারিয়াছেন।'

অক্ষয়কুমার সত্যিই জাতের 'ভেদ মারিয়াছিলেন'। 'নীচজাতীয়' ধাঙ্গড়দের তিনি ঘৃণা করেননি, নিছক গবেষণার উপাদান বা উপাত্ত বলেও মনে করেননি, মানুষের মর্যাদা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের বাংলায় যেখানে জাতিভেদ-বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল তখন তিনি এরকম অবস্থান নিয়েছিলেন। ফলে তিনি একজন ব্যতিক্রমী সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

(গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তর্ক-বিতর্ক

অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ও উৎসাহে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন (ডিসেম্বর, ১৮৪৩ সাল)। দত্ত বেদের অভ্রান্ততা মেনেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয়ের কাছে মূল বিষয় ছিল যুক্তিবাদ। ফলে তাঁর সাথে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম উপাসনা ও অন্যান্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব হতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।' ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গের এই প্রহরীকে তর্কে-যুক্তিতে পরাজিত করতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। উপরন্তু তাঁরা অক্ষয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন অক্ষয়ের দুর্ভেদ্য যুক্তিগুলি।

শিবনাথ শাস্ত্রী পরিষ্কার করে সে-কথা লিখেছেন—"১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্তবাদ পরিত্যাগ করিলেন।" আরও ঘটনা আছে—তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যেই অক্ষয় দত্ত, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র রামমোহনের অনুসরণে *আত্মীয় সভা* (১৮৫২ সাল) নাম দিয়ে আর একটি সভার গঠন করেন। সভার বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন যুক্তিবাদী প্রশ্নশীল। এই সভার অনেকে দাবী করতে শুরু করলেন, প্রার্থনা যদি করতেই হয় তাহলে সেটা বাংলায় কেন করা যাবে না? ঈশ্বর কি সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ভাষা বোঝেন না? একথা নিশ্চয়ই বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না যে এই ধরনের প্রশ্নগুলিই আসলে যে কোনো ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট ধ্বংসাত্মক। আত্মীয় সভার সভ্যদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক প্রশ্নগুলির আলোচনা করা; কিন্তু ক্রমশ ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বগুলিও তাদের আলোচনার অন্তর্গত হয়ে পরে।

অক্ষয় দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উপরেও অসন্তুষ্ট ছিলেন; কারণ, ঐ গ্রন্থের প্রচারে বেদ-উপনিষদের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর সমানই থেকে গিয়েছিল। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে এক বক্তৃতায় বলেন যে 'ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যা কিছু যথার্থ বিষয় আবিষ্কার করেছেন, তাও আমাদের শাস্ত্র; গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কঁত (Comte) যেকোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করেছেন, তাও আমাদের শাস্ত্র।' মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস ও কঁতের নাম ছিল; এই দুটি নাম নাস্তিকের বলে পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার সময় ব্রাহ্মসমাজের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ তা বাদ দিয়ে দেন; তাতে অক্ষয়ের খুবই বিরক্তি হয়েছিল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক 'ডীজম্' করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন।

আসলে, দেবেন্দ্রনাথের *ব্রাহ্মধর্ম্ম,* যা বেদান্তের স্থান দখল করেছিল, তাঁর নিজের হিন্দু পক্ষপাতিত্ব (bias) ও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদের মধ্যে এক আপস ছিল। এই গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের কাছে মনের প্রার্থনা নিবেদন করলে আশাজনক ফললাভ হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। অথচ সেই একই সময়ে হিন্দু হস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয়ের কাছে ঈশ্বরকে *'প্রার্থনা'* করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি একটি সরল সমীকরণ বলে এই প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন,

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

সুতরাং, প্রার্থনা = ০ (শূন্য);

কৃষকরা পরিশ্রমের দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন। পরিশ্রমের সাথে প্রার্থনা করলেও সেই একই পরিমাণ শস্যই উৎপাদিত হয়। তাই প্রার্থনার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ, তাঁর মতে, প্রার্থনার কোন ফল নেই। প্রার্থনা ও কাজ আসলে বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিষয়। অনুশীলন করলে কাজ হয় বা ফল পাওয়া যায়। কারণ এর বাস্তবতা বিদ্যমান। তাছাড়া প্রার্থনার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্যবাদীদের মতে প্রার্থনার একটি অলৌকিক সম্পর্ক বিদ্যমান। আসলে বিশ্বাস ছাড়া প্রার্থনার কোন বাস্তব ভূমিকা নেই। আর এই জন্যই প্রার্থনা ভাববাদ রূপে পরিচিত। এই সমীকরণ নিয়ে তৎকালীন কলিকাতায় হৈচৈ শুরু হলে তিনি এই যুক্তি যে সহজ-সরল ভাবনার পরিচায়ক তা ব্যক্ত করেছিলেন। এবং এই যুক্তি প্রমাণ করে তিনি কতটা যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রার্থনাকে অকেজো বলে নাকচ করলে প্রার্থনার লক্ষ্য যে দেব-দেবী বা পরমেশ্বর তাকে আর প্রার্থনা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হয় না। এভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হল।

(ঘ) অক্ষয় দত্তের রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

তিনি 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন। পরে সম্পাদনা ও লেখক হিসেবে তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি আমরা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দেখতে পাই। এছাড়া তিনি অনেকগুলি বইও লিখেছেন। সেই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার, ধর্ম ভাবনার কোন পরিবর্তন ধরা পরে কি না সেটা বিচার্য্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকার শুরুর সংখ্যাগুলিতে আমরা কোনরকম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পাই না। সেখানে ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ক লেখাই রয়েছে। এরপর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় জীব/প্রাণী বিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রচনা/প্রবন্ধ দেখতে পাই। আসলে পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধতেই এই পরিবর্তন ফুঁটে উঠেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিককে উন্মুক্ত করেছিলেন।

গবেষক ও নিবন্ধকাররা মনে করেন যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় *"পরমেশ্বর"*-এর উল্লেখ করেছেন যা ছিল নিজের ইচ্ছার বাইরে ও তাতে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা-প্রভাব ছিল বেশি। নিজের *কর্মচারীর* প্রতি দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার চাপ সৃষ্টি করে এই কাজগুলি করেছিলেন। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "পেপার কমিটি"র সদস্যদের চিন্তা-ভাবনার প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। তিনি এই পেপার কমিটি সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, *"কতগুলি নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হয়েছে। এদেরকে এই পদ থেকে তাড়িয়ে না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নেই।"* আজকের দিন হলে, তাঁর লেখায় কোনও ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শনের দরকার হত না। এইসব তিনি লিখেছেন ১৮৫০-এর দশকে।

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের সাথে অক্ষয়ের তর্ক-বিতর্ক দীর্ঘদিন চলেছিল। ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বসু একবার ১৮৫০ সালের মাঘোৎসবের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"যে পর্যন্ত তোমার (অক্ষয়ের) চরিত্র শোধন না কর-সে পর্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থ বাহক চতুষ্পদ তুল্য।" রাজনারায়ণের সুদীর্ঘ লালিত অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে অক্ষয় দত্তের জন্য আঘাত পড়ায় তাঁর ভেতরের অসন্তোষ তিনি চেপে রাখতে পারেননি। বলতে চেয়েছেন, 'তুমি পিঠে করে অনেক গ্রন্থ বহন করে চলেছ; কিন্তু সব গ্রন্থের সার যে ঈশ্বরভক্তি, তা তুমি অন্তরে গ্রহণ করতে পার নি। অথচ, বইয়ের ভার এত বেশি যে তোমাকে শুধু দুপায়ে ভর দিয়ে নয়, দুই হাতেও ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে।' মন্তব্যটিতে যুক্তিবাদীর বিরুদ্ধে সৌজন্যের কিঞ্চিৎ ঘাটতি থাকলেও ভক্তিবাদীর মর্মবেদনা প্রকাশে তা একেবারে অনবদ্য।

এই সম্ভাষণের গূঢ়ার্থ বুঝতে হলে প্রার্থনা-সমীকরণটি ছাত্রদের সাথে সময়কালে দত্ত যে প্রবন্ধগুলি/গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন সেগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়া হল—তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বইয়ের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দার্শনিক গুরুত্ব সম্পন্ন তাঁর প্রথম বই *'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৫১ সালে ও ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মৌলিক রচনা নয়। স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞান লেখক জর্জ কুম্বের (১৭৮৮-১৮৫৮ সাল) ১৮২৮ সালে লেখা *'Essay on the Constitution of Man and its Relation to External Object'* বইটির প্রায় একরকম ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। প্রবন্ধকার আশীষ লাহিড়ী বলেছেন, অক্ষয়ের জীবনের প্রথমদিকে জর্জ কুম্বের প্রভাব ছিল। তাই তিনি *বাহ্যবস্তু* বইটি লিখেছিলেন। এরপর আমরা তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলে চিনব যখন তিনি বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক করছেন ও প্রশ্ন তুলছেন।

তাঁর রচিত *'চারুপাঠ'*-এর তিনটি খন্ডে তিনি যে সমস্ত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁর কয়েকটি উদাহরণ দিলে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। যথা- আগ্নেয়গিরি, সিন্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকার পুরু ভুজ, পৃথিবীর পরিমাণ, উষ্ণ প্রস্রবণ, দীপ মক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বনমানুষ, বল্মীক, হিমশিলা, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যোমযান, বর্ষণবৃক্ষ, দিগদর্শন, প্রবাল, চন্দ্র, আলেয়া, সৌরজগত, গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাপমান, উড্ডীয়মান মৎস্য, পতঙ্গভুক বৃক্ষ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ, অন্ধ মৎস্য ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে উপলক্ষ্য করে তিনি সমকালে প্রচলিত নানারকম ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদগুলি ভ্রম মুক্ত করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা ও জ্ঞানের স্পর্শ দিতে চেয়েছিলেন।

উনিশ শতকে ব্রাহ্ম্যণ্যবাদের প্রভাবে সমুদ্র যাত্রা (কালাপানি) নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বাধা-নিষেধ ছিল, যা ভুল প্রমাণ করার জন্য *"প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার"* (১৮৪৯ সাল) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে *"বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ"* (১৮৫৫ সাল) রচনা করেন। এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের দার্শনিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত, আমরা এই কথাটা সহজেই বলতে পারি।

এবং তাঁর সর্বশেষ রচনা হল *"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"*, যা মূলত হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বর্ণনা। অধ্যাপক সুশোভন সরকারও বলেছেন এই গ্রন্থটি হল 'ধর্মীয় আখ্যান'। কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় উল্লেখ না করে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় বলেছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর গবেষণা ও যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যার পরিচয় বহনকারী। রাজনারায়ণ বসু অভিযোগ

করেছিলেন অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মবাদের উপর বিশ্বাস থেকে সরে এসে অজ্ঞেয়বাদী হয়ে ওঠেন, যার প্রমাণ ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়-এর অনেকগুলি পাতা। আসলে এই সময় তিনি নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন।

প্রায় এই সময়েই তিনি লিখেছেন *"ধর্ম্মনীতি"* (১৮৫৬), *"ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব"* (১৮৫৫) এবং *"পদার্থবিদ্যা"* (১৮৫৬)। ধর্ম্মনীতি বইটি কুম্ব রচিত *'Moral Philosophy'* (বইটি) অনুসরণে লেখা। তিনি ধর্ম্মনীতি বলতে Principles of Morals বুঝিয়েছেন। এগুলি কোন ধর্মীয় (Religious) গ্রন্থ না, 'Moral Philosophy' একটি প্রাচীন ধারণা। রেনেশাঁ পূর্বের এই ধারণাই তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার পরাধীন নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। *ধর্ম্মনীতি* গ্রন্থে তিনি নৈতিক আলোচনা করতে গিয়ে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি *পদার্থবিদ্যা* বইয়ে ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের (Physics) বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ অনুবাদ করে নিজের ভাষায় ও ঢঙ্গে লিখেছেন।

(ঙ) অক্ষয়কুমার দত্ত-এর ধর্ম্মনীতি ও ধর্মবোধ

তাঁর 'ধর্ম্মনীতি' বইয়ের 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ Religion (ধর্ম) নয়, বইয়ের শুরুতেই তিনি লিখেছেন—'ধর্ম্মনীতি অর্থাৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়িনী নীতিবিদ্যা (Principles of Morals). এই বইটি বিভিন্ন ইংরেজি বই অবলম্বনে লেখা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করলে ধর্ম্মের স্বরূপ কি এবং কোন কোন কাজ যথার্থ ধর্ম্ম এই দুটি বিষয়ে অবগত হওয়া (জানা) যায়, তাকে ধর্ম্মনীতি বলে(পৃ. ৪৪০)। দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি তাঁর ছাত্র জীবনে সমাজ সংস্কারক হওয়ার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ধর্ম্মনীতি বইটি পড়ে।

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য অক্ষয় দত্তের মতাদর্শের পরিবর্তন নির্ণয় করা। ব্যক্তির জীবন-যাপন, লেখালেখি তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তনের সাক্ষী। দত্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি আমৃত্যু সত্য সন্ধানী মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর জীবনের প্রতি পদে পদে আমরা তাঁকে সত্যকে আঁকড়ে ধরতে দেখেছি। তিনি উনিশ শতকের এক আপোষহীন চরিত্র ছিলেন। তাঁর কর্মহীনতা, শারীরিক অসুস্থতা তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। পরিশেষে, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* -তাঁর দীর্ঘ গবেষণামূলক গ্রন্থ

প্রেক্ষাপট

অক্ষয় দত্ত জীবনের মাত্র ৩৫টি বছর সুস্থভাবে কাটিয়েছিলেন। তিনি 'শিরোরোগ' (শিরোঃপীড়া) [*মাইগ্রেইন* বা Migraine] আক্রান্ত ছিলেন। এই প্রবল অসুস্থতার মধ্যে কি করে তিনি ভা উ-স বইটি রচনা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—*আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই বালীতে উপস্থিত হইলাম। যে সময়ে উপস্থিত হইলাম, তখন অক্ষয়কুমার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' উপক্রমণিকা-অংশ শ্রীরামকে দিয়া লেখাইতেছিলেন। কোনদিন পাঁচ ছত্র, কোনদিন দশ ছত্র মুখে মুখে বলিতেন ও শ্রীরাম লিখিয়া লইত। তাঁহার নিজে লিখিবার সামর্থ্যের অভাব হইয়াছিল। অতিকষ্টে আটদশ ছত্র লিখাইয়াই ক্লান্ত হইতেন ও পুনর্বার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্টবোধ হইল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা লেখাইতে পারিয়াছিলেন; এই ২৮২ পৃষ্ঠা অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্তি।*

১৮৫০-এর দশকে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন—চারুপাঠ ১ম ভাগ (১৮৫৩ সাল), ২য় ভাগ (১৮৫৬ সাল) ও ৩য় ভাগ (১৮৫৯ সাল) এবং ধর্ম্মনীতি ও পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬ সাল)। এরপর তাঁর *ভা উ-স* ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। অর্থাৎ চারুপাঠের ৩য় ভাগ ও ভা উ-স ১ম ভাগ প্রকাশের মধ্যে দীর্ঘ ১১ বছরের ব্যবধান। এবং এর ১৩ বছর পরে ১৮৮৩ সালে ভা উ-স ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারি, এই সময়কার রচনাগুলির মধ্যে এতটা সময়ের ব্যবধানের কারণ কেবলমাত্র তাঁর শিরোরোগ।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল তিনটি খণ্ডে ভা উ-স প্রকাশিত করার কিন্তু শিরোরোগের জন্য তিনি ৩য় ভাগ লেখার কাজ শুরুই করতে পারেননি! প্রকাশিত এই গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ডের) ভূমিকায় তিনি নিজেই নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা বেদনাবিধুর ভাষায় বলেছেন। আজ যখন আমরা তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাস' গ্রন্থটি পড়ি তখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, এর প্রতিটি পংক্তির গায়ে আছে একটি মহান মুক্তমন মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রামের পঁচিশ বছরের (এক)টানা পল পল (শারীরিক) যন্ত্রণার নিঃশব্দ-লাঞ্ছনা।

তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছিলেন- 'যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়া অক্ষয়কুমার এই বিরাট এবং তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি (ভা উ-স) রচনা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা সকল দেশেই কদাচিৎ পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রচিত *রামতনু*

লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে লিখেছেন—"আশ্চর্য জ্ঞানস্পৃহা! আশ্চর্য কার্যশক্তি! ইহার পরে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিক কি তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সংকলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে, সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন একঘণ্টা কোনও দিন দেড়ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়া এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল।"

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয় শিরোরোগ নিয়ে এক বৃহৎ প্রকল্প হাতে তুলে নিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি—'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'-এর ইতিহাস রচনা। এই বইটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ সালে। তিনি এই বইয়ে আসলে উপাসক সম্প্রদায় বলার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বর্ণনা দিয়েছেন। এবং তিনি সচেতনভাবেই ধর্মীয় সম্প্রদায় কথাটির পরিবর্তে উপাসক সম্প্রদায় নামটি ব্যবহার করেছেন। অনুমান, নইলে তাঁর এই দীর্ঘ গবেষণামূলক গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না।

ভারতে অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। তৎকালীন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল হোরেস হিম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০ সাল) হিন্দু সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা করে মাত্র ৪৫টি সম্প্রদায়ের কথা লিখেছিলেন। তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি দুটি অংশে *"A sketch of the religious sects of the Hindus"* শিরোনামে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে বেরিয়েছিল [Asiatic Researches, vol. XVI, 1828 and vol. XVII, 1832]. পরে এটি একত্রে ১৮৬২ সালে তাঁর রচনাবলির প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়।

হোরেসের এই প্রবন্ধ থেকেই হয়ত দত্ত তাঁর আলোচ্য বইটি লেখার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হাত দিলেন ১৮২টি সম্প্রদায়ের কাহিনীতে। চার গুণেরও বেশি কাজ। পুরোটাই তিনি একা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে করে সম্পন্ন করেছেন। তাই ম্যাক্সমূলার লিখেছিলেন, 'আপনার মৌলিক গবেষণাদ্বারা আবিষ্কৃত তথ্যগুলি বহুমূল্য'। প্রাচীন ভারত নিয়ে এই বইয়ে অক্ষয় অনেক কিছু লিখেছেন যা ইতিহাস-ভূগোলের (সমাজ বিজ্ঞানের) নিরিখে সত্যিই নতুন ও অভিনব ছিল।

তিনি বইপত্র পড়ার পাশাপাশি সরাসরি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে অনেক রকম তথ্য পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকেছেন, মিশেছেন, কথা বলেছেন, বুঝেছেন। তবে

লিখেছেন। এই কারণেই ভারতীয় সমাজ তথা ধর্মীয় সমাজের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাপেক্ষে বইটির আজও একটি আকর গ্রন্থমূল্য আছে, যা সেই যুগের খুব বেশি বইয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় না। আর এতবড় একখানা কাজ, যার সমতুল্য কিছু তখন পর্যন্ত কোনও ভারতীয়ের একক বা সমষ্টিগত উদ্যোগে সম্পন্ন হয়নি, একা করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর সময় লেগেছে অনেক।

শুধু মুখে মুখে বলে গেছেন এবং প্রাসঙ্গিক বইপত্র পড়েছেন আর তাতেই এই মহাগ্রন্থের দুটি ভাগ রচিত হয়েছিল, তা মনে করার কারণ নেই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে লিখেছেন—*"১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কি ইংরাজি, কি জার্মান, কি ফ্রেঞ্চ, কি ল্যাটিন কি বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের উপক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যতপ্রকার উপাসক-সম্প্রদায় আছে মোটামুটি তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা প্রণালী ও ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম লিখিয়া গিয়াছেন।....."*

এই ধরণের গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার উপযোগী গবেষণাপদ্ধতি (Methodology) তখনও সমাজবিজ্ঞানে আসেনি। আর যখন এই গবেষণাপদ্ধতি এসেছে, তখন ভারতবর্ষের উপাসক (ধর্মীয়) সম্প্রদায়গুলির অনেকগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করা গেলে এই গ্রন্থটি আরও রোমাঞ্চক হয়ে উঠত একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু আজও এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে আকর গ্রন্থ। কিন্তু দত্তের জীবিতকালে এই গ্রন্থটি বিশেষ প্রচার পায়নি, এই গ্রন্থটি প্রচারের আলো পেতে শুরু করে ১৯১০'র দশক থেকে যখন রাজেন্দ্রলাল মিত্ররা বিজ্ঞানমূলক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন।

দত্তের এই বইটি অন্য একটি কারণেও অনন্য। কারণটি হল বইটির *উপক্রমণিকা* (ভূমিকা)। যা মূল বইয়ের আয়তনের চেয়ে অনেক বড়, এরকম সাধারণত হয় না! "উপক্রমণিকা" শীর্ষক এই ভূমিকা আবার দুই খণ্ডে বিভক্ত। অর্থাৎ ভা উ-স প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মিলে। এও কোনও বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কলকাতার করুণা প্রকাশনীর তরফে পুনর্মুদ্রিত বইটির দুটি ভাগ—যার মধ্যে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (২০১৫ সাল) এবং দ্বিতীয় ভাগ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ (২০১৩ সাল)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ভাগে মূল বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪, তন্মধ্যে "উপক্রমণিকা"-এর জন্য বরাদ্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১১২। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ভাগে "উপক্রমণিকা"-এর জন্য বরাদ্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৩২০। এবং সম্প্রদায়গুলি বর্ণনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২২৮ পৃষ্ঠা। দুই ভাগ

মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, উপাসক সম্প্রদায়ের জন্য যেখানে লেগেছে ৩৮০ পৃষ্ঠা, সেখানে "উপক্রমণিকা"-এর জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ৪৩২ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ, অখণ্ডভাবে ধরলে গোটা বইয়ের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে এই উপক্রমণিকা (ভূমিকা)। এতবড় একটি উপক্রমণিকা সত্যিই বিস্ময়কর!

বর্তমান গবেষকের কাছে এই উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থটির উপক্রমণিকা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সম্প্রদায়গুলি নয়। কারণ সেই আলোচনাগুলি গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু থেকে ভিন্নধর্মী। এই উপক্রমণিকার ঐতিহাসিক ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। ড. সুকুমার সেনের মতে, "দুই ভাগেরই উপক্রমণিকা অংশ সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান্। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য্য (ইন্দো-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য্য (বৈদিক ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এইই প্রথম।" অর্থাৎ তিনি ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি এরকমভাবে বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন কারণ এতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা নয়, এর দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে দুই ভাগের দুই উপক্রমণিকার মধ্যে সবচেয়ে মন মুগ্ধকর অংশ হল বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক ধারার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। মূল বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে ভূমিকায় আলোচিত বিষয়ের খুব একটা তেমন সম্পর্ক নেই। একটা বইয়ের নাম শিরোনামে যা দেওয়া আছে সেইরকম হতে কোনও বাধা নেই। দ্বিতীয় বইটির নাম বোধ হয় বিষয়বস্তু অনুযায়ী হওয়া উচিত ছিল 'ভারতে নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদের বিকাশ তথা অনুশীলন'।

আরও লক্ষণীয়, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত যেন প্রথম বইটিতে ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র ধর্মসংস্কৃতি বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর বহুদিনের পরিশ্রমজাত ও বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত অনুপুঙ্খ ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন; আর দ্বিতীয় বইতে তিনি তাঁর নিজস্ব দার্শনিক বিচার, ভারতীয় চিন্তাশীলদের বিভিন্ন দার্শনিক মতের পরিচয়, পারস্পরিক তর্কবিতর্ক খণ্ডন-বিখণ্ডন, ভারতীয় প্রাচীন মনন-ঐতিহ্যে নিরীশ্বরবাদ এবং বস্তুবাদের নানা শাখার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ভারত গ্রিস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ভাষা তথা অন্য নানা বিষয়ে সাদৃশ্য, ইত্যাদি বহু চিত্তাকর্ষক বৌদ্ধিক উপকরণ তুলে ধরেছেন।

বইগুলিতে শুধু যুক্তিবাদী বিচারধারা নয়, আছে যুক্তিবাদের মননশীল ফসল। এতে পাওয়া যায় শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আবাহনী নয়, আগমনী নয়, তার পাশাপাশি আমরা পাই সমাজ

সংস্কৃতি ভাষা দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অখণ্ড বিজ্ঞানমানস প্রয়োগের ফল স্বরূপ এক উৎকৃষ্ট বিচার পদ্ধতি ও অভাবিতপূর্ব সিদ্ধান্তরাশি। প্রথম বইটি শেখায়, কোনও একটি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে কীভাবে তথ্যানুসন্ধান করতে হবে। দ্বিতীয়টি থেকে শেখা যায়, কোনও একটা দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে দীর্ঘপ্রচলিত বিভ্রান্তিগুলিকে কীভাবে কাটানো যায়। সেদিক থেকে বই দুটি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন গ্রন্থন নয়, পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু তবুও আলাদা।

অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি যদি এই দুখানা বই আলাদা করে লিখতেন, তাহলে—তিনি বোধ হয় ঠিকই বুঝেছিলেন—উপাসকদের ইতিহাস অবশ্যই বাংলার মনন-ইতিহাসে টিকে যেত, এদেশের প্রধান ধারার মননচর্চায় যথেষ্ট প্রশ্রয় এবং আশ্রয়ও পেত; কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দার্শনিক বিচারের উপক্রমণিকা আজ ইংলন্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একমাত্র কপি ছাড়া আর কোথাও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যেত না। আর তিনি এই রচনাটিকেই ভাবীকালের হাতে তাঁর প্রকৃত বৌদ্ধিক-উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থটির পূর্বোক্ত বিচিত্র বিন্যাসের এটাই হয়ত (যুক্তিসম্মত) ব্যাখ্যা।

প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত উপক্রমণিকার অংশে অক্ষয় দত্ত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ মাক্সম্যুয়েলার-এর অনুসরণে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে আর্যভাষা গোষ্ঠীর ধারণা উপস্থিত করেছেন এবং তারপর মূলগ্রন্থ থেকে আর্যদের ধর্ম হিসেবে বৈদিক ধর্ম ও ইরানীদের অবেস্তা ধর্মের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি একদিকে বৈদিক সাহিত্য থেকে মূল সংস্কৃত ও অন্যদিকে অবেস্তায় প্রাচীন পারসিক ভাষার মূল উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। বোধহয়, অক্ষয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় আর্যগোষ্ঠী ও ইরানী আর্যদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা। এই প্রসঙ্গে অসিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন, আর্যদের বিষয়ে এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ কয়েকটি পৃষ্ঠা উনিশ শতকে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন, আর্যরা একটি জাতি গোষ্ঠী (Race). কিন্তু আর্যরা মূলত একটি (ইন্দো-ইউরোপিয়ান) ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। আর্যরা ভারতের আদি নিবাসী ছিল না। তারা বাইরে থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিল। ভারতের প্রাচীন নিবাসী ছিল হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার অধিবাসীরা। তিনি লিখেছেন, হিন্দু-ধর্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন(১ম, পৃ. ১)। তিনি লিখেছেন, যে আর্য জাতি গ্রীসে গ্রীক নাম গ্রহণ করিয়া আপনাদের মানসিক শক্তির প্রাচুর্য এবং

অধ্যুষিত দেশের নৈসর্গিক ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অল্পতা ও ক্ষীণতা বশতঃ আপনাদের দেবগণকে মানব-গুণেরই অবতার স্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই আর্য জাতিই ভারতবর্ষে হিন্দু নাম অবলম্বন পূর্বক চতুর্দিকস্থ নৈসর্গিক ব্যাপারের অতিমাত্র প্রভাব ও তেজস্বীতা দর্শনে ভীত চমৎকৃত হইয়া নৈসর্গিক দেবগণকেই সর্বপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন(১ম, পৃ. ৮২)।

এই তথাকথিত হিন্দুদের ভারতীয় উপমহাদেশে বাসস্থান কোথায় ছিল? এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হল—যদিও হিন্দুরা অগ্রে পঞ্চনদে আসিয়া অধিবাস করেন, তথাচ বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম প্রথমে সরস্বতী-তটে অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রণালীবদ্ধ ও পরিস্ফুটিত হয়। .....সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুটি দেবনদীর মধ্যগত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। .....ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুদিগের প্রথম নিবাস ভূমি পঞ্জাব ও সারস্বত-দেশীয় নদী সমুদায়ের পরিচায়ক ভূরি ভূরি বচন ঋগ্বেদ-সংহিতায় সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু তাহাতে গঙ্গা-যমুনার নাম অতীব বিরল। .....সিন্ধু ও সরস্বতীর উদ্দেশে (উদ্দেশ্যে) যেমন বহুতর স্বতন্ত্র সূক্ত উক্ত হইয়াছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার গঙ্গা নদীর স্তুতিগর্ভ তাদৃশ একটি সূক্তও বিদ্যমান নাই। .....ঋগ্বেদ-সংহিতায় হিমালয়ের নাম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু উহার কোন অংশে বিন্ধ্যগিরির নাম লক্ষিত হয় না(১ম, পৃ. ৭০-৭২)।

দত্ত মনে করতেন, সমগ্র বেদ-এর মধ্যে যথেষ্ট কালগত ব্যবধান আছে। তিনি বলেছেন, সমস্ত (বৈদিক) সংহিতা একসময়ে 'রচিত ও সঙ্কলিত' হয়নি এবং কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের ধর্ম তার মধ্যে প্রকাশিত হয়নি(১ম, পৃ. ৫৯)।তিনি প্রাচীন ভারতের বর্ণ প্রথা সম্পর্কে লিখেছেন—ব্রাহ্মণ সমুদায়ে হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থা নানা বিষয়ে বর্ধিত দেখা যায়। সে সমস্ত সঙ্কলিত হইবার সময়ে বর্ণভেদ প্রণালী একরূপ সম্পূর্ণ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। প্রথমোক্ত তিন বর্ণ আর্য বংশীয়; শূদ্রেরা অনার্য্য। কৃষ্ণবর্ণ দস্যু বা দাসদের সহিত শুভ্রবর্ণ আর্যদিগের বদ্ধমূল বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ প্রসঙ্গ ঋগ্বেদ সংহিতার বহুতর স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পূর্ব নিবাসী ঐ দস্যু বা দাসদিগের মধ্যে যাহারা মহাবল পরাক্রান্ত আর্যগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে, তাহারাই শূদ্র বোধ হয়। ঐ দাস সংজ্ঞাটি শূদ্রদের চিরসঙ্গী হইয়া আসিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিচারের বা নিরপেক্ষতার অভাব আমরা লক্ষ্য করি ঐতিহাসিকদের মধ্যে। যদিও এর সূত্রপাত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মাধ্যমে। যা অনুসরণ করেছিল আমাদের দেশের প্রথম পর্যায়ের ঐতিহাসিকরা এবং যার প্রভাব এখনও বর্তমান। তাই আমরা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকরণ দেখতে পাই। দত্ত তাঁর স্বাধীন

ও মুক্ত মন দিয়ে বৈদিক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে যে উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন তা তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন,*"এখন, বেদ-প্রাণ হিন্দুমণ্ডলি! শ্রবণ কর! তোমাদের প্রাচীন মীমাংসকগণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্বকালীন আচার্য্যগণ না ঈশ্বরই মানিতেন, না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা নির্দেব ও নিরীশ্বর। যে মীমাংসায় যাগ-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বিষয়েরই বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমাংসা দর্শন যে নাস্তিকতাবাদী একথা শুনিলে আপাততঃ অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন বোধ হয়। কিন্তু একথার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। মীমাংসা পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকণ্ঠে ও সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন"*(২য়, পৃ. ৪১)।

প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিদের সম্পর্কে বৈদান্তিকদের যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তাও একবার শুনে নেওয়া যাক:*.....প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্—একটি বেকন্–একটি বেকন্ তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। সেই দার্শনিকদের চিরস্থায়ী সূর্য্যপ্রভা আবশ্যক ছিল*(২য়,পৃ. ৫২-৫৩)। কোন 'সূর্য'-এর কথা অক্ষয় দত্ত বোঝাতে চেয়েছিলেন? "রত্নগর্ভা ইয়ুরোপ দুইকালে যেরূপ দুইটি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন, সেরূপ আর কস্মিনকালে কুত্রাপি হয় নাই। বেকন্ ও কোন্ত, দুই ভূ-খণ্ডের (ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দেশের) উপর দুই সূর্য্য। ঐ দুইটি পরম পবিত্র জ্যোতির্ময় শব্দ মূর্ত্তিমান জ্ঞানেরই সংজ্ঞা। ঐ দুইটি নামের উজ্জ্বল মহিমায় বসুন্ধরা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন"(২য়,পৃ. ৫৩)। অক্ষয় দত্তের চিন্তার (মতাদর্শ) ক্ষেত্রে এঁদের প্রভাব ছিল অবিস্মরণীয়। তিনি বেকনীয় অভিজ্ঞতাবাদ প্রসূত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেছেন, বেদবিশ্বাস নিয়ে তিনি যেমন ঠাট্টা করেন, তেমনি ঈশ্বর বিশ্বাসীদের চমকে দেওয়ার জন্যেই তিনি ষড়দর্শনের প্রসঙ্গ এনেছেন। নইলে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়-এর "উপক্রমণিকা"য় দর্শন প্রসঙ্গ আনার কোনো দরকার ছিল না। দত্ত লিখেছেন, "এই ষড়দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্ত্তা (প্রথমে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না, তিনিই সমুদায় সৃষ্টি করেন এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা) স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব-স্রষ্টা না বলিয়া বিশ্ব-নির্ম্মাতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসা পণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব

স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্ত্তার সম্ভাবনা কি?(২য়,পৃ. ৫৪)।

তিনি সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব-এর সাথে তাঁর সমকালীন জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের *"On The Origin of Species* (1859) গ্রন্থের অভিযোজন তত্ত্বের (The Theory of Evolution) মিল খুঁজে পান। তিনি লিখেছেনঃ অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ সর্বপ্রধান ইয়রোপীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মত The Theory of Evolution কিয়দংশ কি এই সাংখ্য মতের অনুরূপ বোধ হয়-না? তাঁহারা বলেন, যেমন শূককীট রূপান্তরিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক বস্তু ও এক প্রাণী পরিণত হইয়া অন্য বস্তু ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়া আসিয়াছে। কপিল ঋষি তাহাঁদের ঐ মতের একটি সঙ্কুচিত অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন একথা বলিলে কি বলা যায় না? কপিল কৃত বস্তু সৃষ্টির ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক না হলেও তা জীবের অভিযোজন তত্ত্বের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

সাংখ্য দর্শনের কয়েকটি বিষয় নিয়ে অনেক "তর্ক-বিতর্ক বিচার ও সিদ্ধান্ত" আছে, অক্ষয় দত্ত সেই সব বিষয়কে "কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক" বলে উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য শাস্ত্রে অধিকাংশই তো ভ্রান্তি-ভূধরের বর্ণনা বই আর কিছুই নয়। মানুষে বুঝি ঐ অতি দুর্ভেদ্য ভূধর শ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ অতিক্রম না করিলে, তত্ত্বভুবন আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না(২য়,পৃ. ৫)। এ যেন বিদ্যাসাগরের সেই সাংখ্য ও দর্শনকে ভ্রান্ত বলা মন্তব্যের ভাবসম্প্রসারণ! তিনি এর অনেক কিছুই যে ভুলভ্রান্তির শিকার তা পাঠককে একেবারে গোড়াতেই জানিয়ে রাখছেন। অক্ষয় দত্ত যে উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিখছেন, তাকে এখানে বলেই দিচ্ছেন ভ্রান্তিভূধর! ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ যার চর্চা করেন তা ভ্রান্ত মতাদর্শ ছাড়া আর কিছু নয়! আর সেই *"অতি দুর্ভেদ্য ভূধরশ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ"* এই (ভা উ-স) বইতে তিনি অতিক্রম করছেন সত্য জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে।

তিনি লিখেছেন, ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ববাদি-সম্মত। শ্রীমান ডেল্টন ইদানীং (অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন) ইহার পুনরুদ্ভাবন করেন এবং রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত বিচারক্রমে একরূপ সপ্রমাণ অথবা অতিমাত্র সম্ভাবিত করিয়া তুলেন। তাহার দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্ত্তিত করেন তাহার সন্দেহ নাই। পূর্বকালে গ্রীস দেশে শ্রীমান ডেমক্রিটস এইরূপ পরমাণুবাদ প্রকাশ করিয়া যান। কণাদের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, স্থির করা কঠিন। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার নিকট ঋণ বন্ধনে বদ্ধ আছেন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্ব স্ব দেশে নিজ

নিজ মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। ডেমক্রিটস্ গ্রীস দেশীয় কণাদ এবং কণাদ ভারতবর্ষীয় ডেমক্রিটস্(২য়, পৃ. ১৯)। এইভাবে তিনি প্রাচীন ভারতের দর্শন শাস্ত্রের জয়গান করেছিলেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ-প্রথমত, এতে অক্ষয় দত্ত নিজের দার্শনিক মত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, নানা মতাদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বারবার ঔপনিবেশিক শাসনে দেশের দুর্গতি, মূল্যবৃদ্ধি, অপরাধ বৃদ্ধি ও নানাভাবে সমাজের অধঃপতনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আক্ষেপ করেছেন। তাঁর তত্ত্ব আলোচনার বড় একটি প্রেরণা এসেছিল তাঁর সমাজ ভাবনা থেকে। দেশের পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে প্রবলভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত করেছিল। ভারতীয়দের তৎকালীন অবস্থা দেখে তিনি এই উপক্রমণিকা অংশের বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই বিষয়ে অকস্মাৎ দুঃখে ও ক্ষোভে ফেটে পরেন। বলে ওঠেন, "সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এক কালের সিংহ-শার্দূল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মূষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে। তাহার বর্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন"(২য়, পৃ. ১৫৫-১৫৬)।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করে ইংলন্ডকে 'উজ্জ্বল ও উন্নত' (ভারতের সম্পদ লুঠ করে ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ) করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা কি হয়েছে? ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য করে অক্ষয় দত্ত বলেন: "…..তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃক্ষয় ও ধর্ম-ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষাদান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষকর দুর্মূল্যতা দোষ ও তৎসহ কৃত অধর্ম বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, ...ভারত রাজ্যের আবগারি ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে তোমার রাজমুকুট-বিরাজিত উজ্জ্বল হীরকখন্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ-কালিমায় প্রকৃত অঙ্গার-খন্ড করিয়া ফেলিয়াছে"(২য়, পৃ. ১৫৮-১৫৯)।

ভা উ-স-এর দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকা শেষ করেছেন, তাঁর কায়িক দুরবস্থার ও আশাভঙ্গের জন্য সাহিত্যরস সমৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে। তবে, অসুস্থতা হয়ত প্রকারান্তরে তাঁকে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিল। তিনি অন্যান্য কাজে কালক্ষেপ করলে এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হত কিনা, সন্দেহ থেকেই যায়। এছাড়া তিনি মন মত যে সব কাজ করতে পারেননি বলে দুঃখ

প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করেছেন, ".....বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন পূর্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা" এবং এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, (তাঁর) "ভূ-তত্ত্ব ও উদ্ভিদ বিদ্যা অবলম্বন করিবার অভিলাষ ছিল"।

উপসংহার

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার কোন ধারার কাছেই অক্ষয়ের কোন ঋণ নেই—না প্রকৃতি দর্শনের ক্ষেত্রে, না জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর চিন্তার প্রধান উৎস পেয়েছিলেন বেকন্ (যাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জনক বলা হয়) এবং অগুস্ত কোঁত (ধ্রুববাদ-এর প্রবক্তা)-এর কাছ থেকে। উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই দুজনেই ছিলেন নতুন এক জগতের দিশারী। রামমোহন রায়ের সময় থেকেই এই নতুন জগতের, চিন্তার সূচনা ধরা হয় [যদিও কোঁত-এর বিষয়ে রামমোহনের কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়, কারণ কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) তাঁর পরবর্তী সময়ের]। তবে এর প্রকৃত শুভারম্ভ হয়েছিল বিদ্যাসাগর ও দত্তের সময় থেকেই।

বাংলায় ধ্রুববাদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'নিরীশ্বরবাদ'। উনিশ শতকের বহু শিক্ষিত বাঙালিই ধ্রুববাদী হয়েছিলেন নিরীশ্বরবাদের টানে। অক্ষয় দত্তও সেই একই ধারার লোক ছিলেন। খাঁটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ নিয়েই তিনি দেখেছেন যাবতীয় আস্তিক দর্শন আর সেই সঙ্গে বেদ-বাদী ও বেদ-বাহ্য (বেদের বাইরের) উপাসক সম্প্রদায়গুলিকে। আর তাঁর এই মূল্যায়ন তাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। যা অমার্জনীয় ভুল। তবে প্রাচীন ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী ধারণার সাথে তাঁর নিরীশ্বরবাদী ধারণার পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে নিরীশ্বরবাদের তিনটি ধারা ছিল—বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক। বৌদ্ধ ও জৈন মতে, কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা নেই। কিন্তু আত্মা, কর্মফল ও পুনর্জন্মের ধারণা আছে। চার্বাক মতে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে শুধু যে কোন ঈশ্বর ধারণাকে গ্রহণ করা হয়নি তাই নয়, সেই সঙ্গে আত্মা, কর্মফল, পুনর্জন্ম, পাপ-পুন্য, প্রায়শ্চিত্ত, পিণ্ড দান, প্রেতলোক, শুচি-অশৌচ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত পরলৌকিক ধারণাকে বর্জন করা হয়েছে। অক্ষয় দত্ত বৌদ্ধ ও জৈন নিরীশ্বরবাদের কেবলমাত্র উল্লেখ করেছেন, সবিস্তারে আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি চার্বাক মত প্রসঙ্গে অনেকখানি আলোচনা করেছেন। তার থেকে মনে হয় তিনি চার্বাক মতাবলম্বীদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে চার্বাক নিরীশ্বরবাদীদেরই সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়।

উপসংহার

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের একজন বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী নেতৃত্ব। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সংস্কার করে সময়োপযোগী করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও বিশ শতকে প্রথমে একেশ্বরবাদ, পরে যুক্তিবাদ ছেড়ে ব্রহ্মবাদ নিস্ক্রিয় হয়ে পরেছিল। যা পরিশেষে বিলীন হয়ে যায়। আজ ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্ম আন্দোলন কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা, অতীতকালের সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পরেছে। এবং তাদের স্থাপত্যকীর্তিগুলি বর্তমান নাগরিকদের কাছে হেরিটেজ/দর্শনীয় স্থান হয়ে রয়েছে।

রামমোহন রায়ের প্রভাবে ও ঔপনিবেশিক শাসকদের পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের জন্য শাসিত ভারতীয়দের জীবন-সংস্কৃতি-কর্মে পরিবর্তন এসেছিল। এবং অক্ষয় ও বিদ্যাসাগর ছিল এর প্রথম সারিতেই। অক্ষয় ও বিদ্যাসাগর দুই জনেরই আত্মমর্যাদা বোধ ছিল প্রখর ও অনমনীয়। ব্যক্তি জীবনে নীতি ও আদর্শ মেনে চলার প্রশ্নে দুজনেই ছিলেন কঠোরভাবে আপসহীন। সেই যুগে বিদ্যাসাগরকে যদি কেউ সঠিক চিনে থাকেন, তবে একমাত্র সেই ব্যক্তিটি হলেন অক্ষয় দত্ত। পাশাপাশি, অক্ষয়কে যদি সেই সময় কেউ সত্যিকারের অর্থে বুঝে থাকেন, তিনি অবশ্যই বিদ্যাসাগর। তাঁদের দুই জনেরই জীবন-যাপন ছিল সাধারণ। কিন্তু তাঁরা নীতিতে ছিলেন অকাট্য। অক্ষয় বেশি দিন প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। এই ছাড়াই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগের তাঁর শিক্ষাভাবনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখা পদার্থবিদ্যা-ভূগোল-চারুপাঠ গ্রন্থগুলিতে কোন তথ্যগত ত্রুটি আজও চোখে পরে না, এই পাঠ্য গ্রন্থগুলি আজও সমানভাবে মনোগ্রাহী। তিনি বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে অক্ষয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য যে কাজ করেছিলেন তা কালজয়ী। তিনি ভাষার সংস্কার করে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, পাঠ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই পথেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। যা এখনও সমান তালে চলছে। যা এখন তত্ত্ব-তথ্য থেকে থেকে ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বহু কৃতি বিজ্ঞানীদের উত্থান ঘটিয়েছে। তাই বাংলার বিজ্ঞানের ইতিহাস সেই সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রমরমিয়ে চলছে।

আধুনিককালে পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পত্রিকা প্রচারের একটি প্রধান অঙ্গ বা মতামত গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তা তিনি দেখিয়েছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে। বিদ্যাদর্শন পত্রিকাটি বেশিদিন না চললেও তাঁর চিন্তার সুর তিনি তাতেই বেঁধে দিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁর হাত ধরে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালি মধ্যবিত্তদের চিন্তার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আজও এই পত্রিকার বিষয়বস্তু আমাদের চিন্তার উদ্রেগ ঘটায়। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এই পত্রিকা। কিন্তু প্রধানতঃ মতাদর্শগত কারণে ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর হাতে তিলে তিলে গড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে তিনি অব্যাহতি নেন। তখন থেকে এই পত্রিকার অবনতি হতে থাকে। যা আর সেই পুরোনো অবস্থায় ফিরতে পারেনি। এই খেদ স্বয়ং পত্রিকার প্রকাশক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন। আধুনিক বাংলা ভাষায় রচনা এই সময়েই দেখা গিয়েছিল। অক্ষয় দত্ত এর পুরোধা ছিলেন।

পারিবারিক প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় প্রভাব ছিল। কিন্তু তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। ফলে তিনি তৎকালীন সময়ের প্রধান ট্রেন্ড পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে পরেছিলেন। যা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ধর্মান্তরিতকরণের ভয়ে ভীত করেছিল। কিন্তু এই ধারণা যে অমূলক ছিল তা প্রমাণিত করে তিনি শুধুমাত্র জ্ঞান শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দর্শনের-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব অন্যদিকে ছিল ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্মবাদ—যা একেশ্বর এর কথা বলে, বেদ-উপনিষদকে প্রাধান্য দেয়, আবার মাঝে মধ্যে পৌত্তলিকতাকেও প্রাধান্য দেয়। ফলে তিনি অনেক তাত্ত্বিক বিচার করে ‘ব্রাহ্মধর্মকে বেদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন।’ এমনকি ব্রাহ্মসমাজের সাংগঠনিক প্রধান দেবেন্দ্রনাথকেও তিনি তাঁর এই চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই লড়াই বেশি দিন টেঁকেনি।

শিরারোগ অবস্থায় অক্ষয় রচনা করেছিলেন তাঁর অক্ষয়কীর্তি ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায় বইটি। গবেষণার উপাত্ত হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এতগুলি ভারতীয় উপাসক নিয়ে গবেষণা তৎকালীন ও বর্তমান সময়ের নিরিখে কালজয়ী। একে তো গবেষণার বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি অন্যদিকে তাঁর শারীরিক পীড়া। ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি ছিলেন আপসহীন, যার জন্য তাঁকে শেষ জীবনে একাকীত্বও ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি জাতিগত (কর্মের) ভেদ মানতেন না তা আমরা গবেষণা

সন্দর্ভে লক্ষ্য করেছি। উনিশ শতকের বাংলা কুসংস্কার-কূপমন্ডুকতার অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে আসছিল, যার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। রামমোহন, ডিরোজিও, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর এঁরা ছিলেন এর পুরোধা। এঁদের মধ্যে অক্ষয় দত্তের চিন্তা-চেতনা ছিল সম্পূর্ণই বস্তুবাদী। ফলে উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি ইতিহাসে প্রোট্রেট হয়ে রয়েছেন।

এই গবেষণা সন্দর্ভের পরে এই গবেষক আশা প্রকাশ করেন যে, অক্ষয় দত্তকে নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছে তার প্রসার ঘটবে। এবং এর ফলে অক্ষয়কে বুঝতে হয়ত আর কেউ ভুল করবেন না। পরিশেষে, আশা করা যায়, তিনি অজ্ঞাত থেকে জ্ঞাত হবেন আমাদের কাছে। এভাবেই হয়ত দুই শতাব্দীর ঋণ শোধ করতে সক্ষম হব আমরা।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান-

গ্রন্থ

অক্ষয়কুমার দত্ত, *চারুপাঠ* (প্রথম ভাগ), কলিকাতা: প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, ১৯৩০ খ্রিঃ (সংশোধিত সংস্করণ)।

-*চারুপাঠ* (দ্বিতীয় ভাগ), কলিকাতা: হেয়ার প্রেস, ১৮৯৬ খ্রিঃ (ত্রিংশবার মুদ্রিত)।

-*চারুপাঠ* (তৃতীয় ভাগ), কলিকাতা: সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি, ১৯১২ খ্রিঃ (একত্রিশতম সংস্করণ)।

-*পদার্থবিদ্যা*: জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম, কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৫৮ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

-*ভূগোল*, কলিকাতা: তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৮৪১ খ্রিঃ।

-*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম ভাগ), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

-*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

-*বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (প্রথম খণ্ড), স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ১১৩-২১৪।

-*বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (দ্বিতীয় খণ্ড), স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ২১৫-৩১৬।

-*বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ*, স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ৩৮৫-৩৯৬।

-*ধর্ম্মনীতি,* স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ৪৩১-৫২৮।

-*শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা,* স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), ২০০৮, পৃ. ১০৯-১১২।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বেতাল পঞ্চবিংশতি,* কলিকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১৮৫৮ খ্রিঃ (সপ্তম সংস্করণ)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী,* সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬০ খ্রিঃ (চতুর্থ সংস্করণ)।

-*ব্রাহ্মধর্ম* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৭৫ খ্রিঃ (দশম সংস্করণ)।

-*ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চ বিংশতি বর্ষের পরিক্ষিত বৃত্তান্ত* (বক্তৃতা: ২৬শে বৈশাখ ১৭৮৬), কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৩৬০ সাল (পুনর্মুদ্রণ)।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয় চরিত,* কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১২৯৪ সাল।

বিহারিলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর,* কলিকাতা: শাস্ত্র প্রকাশ, ১৯২২ খ্রিঃ (চতুর্থ সংস্করণ)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *অক্ষয়কুমার দত্ত* (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১২), কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৯ সাল (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত,* কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তাকালয়, ১২৯২ সাল।

রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা,* কলিকাতা: বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী সভা, ১৯৩৫ খ্রিঃ।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৬ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

প্রবন্ধ

অক্ষয়কুমার দত্ত, 'শিক্ষাদান ও পাঠ্যবিষয় নিরূপণ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ২১-৩২।

-'বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৩৩-৪৫।

-'বিদ্যাশিক্ষা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৪৬-৪৭।

-'বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৪৮-৫১।

-'বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৫২-৫৩।

-'বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৫৪-৫৫।

-'বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৫৬-৫৯।

-'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৬৪-৬৫।

-'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৬৬-৬৮।

-'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৭৮-৮৭।

-'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৮৮-৯১।

-'বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৯২-৯৫।

-'শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ১০৯-১৩৩।

-'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ১৮২-১৮৬।

-'বিধবাবিবাহ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২৯-৩৮।

-'বঙ্গদেশে বর্তমান অবস্থা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৬৬-৭৪।

-'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৮৩-১০৬।

-'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৩৭-১৪০।

-'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৭৫-৮২।

-'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১০৬-১২৬।

-'স্বপ্নদর্শন-বিদ্যাবিষয়ক', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৪৫-১৫০।

-'ভারতবন্ধু রামমোহন রায়', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৫১-১৫৯।

-'ভারতবর্ষীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম কেন গ্রহণ করে?', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২৯-৩৩।

-'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রসঙ্গে', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৩৪-৪৭।

-'হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৯৮-১০৭।

-'ভারতীয় দর্শন', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২৫০-২৯০।

পত্রিকা

বিদ্যাদর্শনঃ

২ সংখ্যা শ্রাবণ ১৭৬৫ শকে (১৮৪২ খ্রিঃ) 'বহুবিবাহ'।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাঃ

২য় সংখ্যা ১লা আশ্বিন ১৭৬৫ শক, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'।

৬৯সংখ্যা বৈশাখ ১৮৪৮ খ্রিঃ 'স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান' (বিদ্যাভ্যাস)।

বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ ১৮৫০ খ্রিঃ 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন'।

ফাল্গুন ১৮৫৪ খ্রিঃ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'।

চৈত্র ১৮৫৪ খ্রিঃ 'বিধবা বিবাহ'।

১৫২ সংখ্যা চৈত্র ১৭৭৭ শকাব্দ 'বহুবিবাহ'।

গৌণ উপাদান-

গ্রন্থ

অশোক মুখোপাধ্যায়, ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত, কলকাতা: অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ, ২০১৩ খ্রিঃ।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা*, কলকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৭ খ্রিঃ।

আশীষ লাহিড়ী, *বঙ্গে বিজ্ঞান (উন্মেষ পর্ব)*, কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২০১৮ খ্রিঃ।

-*অক্ষয়কুমার দত্তঃ আঁধার রাতে একলা পথিক*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭ খ্রিঃ।

-(সম্পা.), *ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুবীজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, কলকাতাঃ বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস, ২০২৪ খ্রিঃ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৬ খ্রিঃ (পঞ্চম সংস্করণ)।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা, *এক হিন্দু আত্মপরিচয়ের খোঁজে*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৬ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

নবেন্দু সেন, *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৬৭ সাল।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, কলিকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ সাল।

বিপন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, কলকাতাঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩/বি (তৃতীয় প্রকাশ)।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা*, আশিস খাস্তগীর (সম্পাদনা), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯ খ্রিঃ (প্রথম আকাদেমি সংস্করণ)।

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯।

-*মুক্তচিন্তার বিস্তার*, কলকাতা: কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*, ১৯৭৮ খ্রিঃ (সংস্করণ)।

রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচনা সমেত)*, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), চুঁচুড়া:, ১৩১৭ সাল (তৃতীয় সংস্করণ)।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *কামারের এক ঘা*, কলকাতা: পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০১৪ খ্রিঃ (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)।

রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৯৩ খ্রিঃ (চতুর্থ সংস্করণ)।

রাজকুমার চক্রবর্ত্তি, *অক্ষয়কুমার দত্ত*, কলিকাতা: ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৩৩২ সাল।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশান (আধুনিক ভারতের ইতিহাস)*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮ খ্রিঃ (পুনঃমুদ্রণ)।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫/এ (তৃতীয় মুদ্রণ)।

Bhattacharya, Tithi. *The Sentinels of Culture: Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-85).* New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Chakrabarti, Sumit. *Local Selfhood, Global Turns: Akshay Kumar Dutta and Bengali Intellectual History in the Nineteenth Century*. UK: Cambridge University Press, 2023.

Datta, Rajat. *Society, Economy and The Market: Commercialization in Rural Bengal c. 1760-1800.* New Delhi: Manohar, 2000.

Dasgupta, Subrata. *The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore.* New Delhi: permanent black, 2007.

Dutta, Akkhoy K. *Who is Brahmo?.* Simla: Himalaya Brahmo Samaj, 1966.

Forbes, Geraldine Hancock. *Positivism in Bengal: A case study in the Transmission and Assimilation of an Ideology*. Calcutta: Minerva Associates (Publications) Private Limited, 1975.

Hatcher, Brian A. *Hinduism Before Reform*. London: Harvard University Press, 2020.

Islam, Muhammad Saiful. *Akshaykumar Datta: The First Social Scientist in Bengal.* Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd., 2009.

Jones, Kenneth W. *The New Cambridge History of India III-1, Socio-Religious reform movements in British India*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Kling, Blair B. *Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*. California: University of California Press, 1976.

Kopf, David. *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969.

– *The Brahmo Samaj and the shaping of the Modern Indian Mind*. New Jersey: Princeton University Press, 1979.

Pal, Satyendranath. *A History of Political Thought of Modern Bengal (Age of Conservative Radicalism*). Calcutta: Firma KLM pvt. Ltd., 1999.

Poddar, Arabinda. *Renaissance in Bengal Quests and Confrontation 1800-1860*. Simla: Indian Institute of Advance Study, 1960.

Mitra, Samarpita. *Periodicals, Readers and the Making of a Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century*. Leiden: Brill, 2020.

Sarkar, Sumit. *A Critique of Colonial India*. Kolkata: Papyrus, 1985.

Sarkar, Susobhan. *On the Bengal Renaissance*. Calcutta: Papyrus, 1979.

Sastri, Sivnath. *History of the Brahmo Samaj*. Calcutta: Sadharon Brahmo samaj, 1974.

Sen, Amiya P. *Explorations in Modern Bengal c. 1800-1900: Essays on Religion, History and Culture*. Delhi: Primus Books, 2010.

Sen, Asok. *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones*. Calcutta: Riddhi-India, 1977.

Subramanian, Lakshmi. *History of India, 1707-1857*. New Delhi: Orient Blackswan private limited, 2010.

প্রবন্ধ

আশীষ লাহিড়ী, বাঙালির বিজ্ঞানচেতনার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ২৮৮-৩০৭।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তঃ বাংলায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-চেতনা, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ২৪১-২৪৩।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৯০-১০২।

রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৭৩-৮৯।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মুক্ত চিন্তার ঐতিহ্যঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ২৭৫-২৮৭।

সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমারকে যেমন দেখেছি, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৬৭-৭২।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৬১-৬৬।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ১২৮-১৩০।

পত্রিকা

অশোক মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বিশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা: সেন্টাস, ২০২০ খ্রিঃ।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রঃ ১৮৪০-১৯০৫* (তৃতীয় খণ্ড), কলিকাতা: বীক্ষণ, ১৯৬০।